মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৭, সংখ্যা-০৬

জুলাই ২০১৮ ইং, জিলকদ ১৪৩৯ হি., আষাঢ় ১৪২৫ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

ذى القعدة ١٤٣٩هـ، يوليو ٢٠١٨م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৩

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪৩....... ৪

দরসে ফিক্বহ :

হজ ও উমরা

তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল.... ৬

মুফতী শাহেদ রহমানী

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৩

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :

শিক্ষাকালে তালেবে ইলমের করণীয়................... ১৪

“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ :

খ্রিস্টধর্ম : কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-১............. ১৯

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) উজ্জ্বল প্রভাতে ফজর নামায পড়তেন..... ৩২

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৬....... ৩৪

মুফতী শরীফুল আজম

চিত্তবিনোদন ও খেলাধুলার শরয়ী বিধান............... ৪২

মুফতী মাহমুদুল হাসান

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৭

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

পবিত্র কা'বার মুসাফিরের প্রতি

মাত্র কয়দিন পরই আল্লাহ তা'আলার রাহের মুসাফিরগণ পবিত্র হজ উপলক্ষে যাত্রা আরম্ভ করবেন। আল্লাহ চাহে তো, এই সফরে তাঁরা ইসলামের সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান হারামাইন শরীফাইন, মিনা, আরাফা, মুজদালাফাসহ বিভিন্ন স্থান জিয়ারত করবেন। হজের যাবতীয় বিধান সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন। যাঁর যাঁর সামর্থ্যানুযায়ী পবিত্র নিদর্শনসমূহের খুব কাছে থেকে ইবাদত করবেন। আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য হাসিলের স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হবেন। রওজা মোবারকে হাজির হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সরাসরি সালাম নিবেদনের মহান মর্যাদা অর্জন করবেন।

হাজী সাহেবানের মনে রাখতে হবে, এই সফর একটি মহিমান্বিত ও পবিত্র সফর। এই সফরের সাথে অন্যান্য সফর বা ভ্রমণের তুলনা করা যাবে না। তাঁদের উচিত হলো, এই সফরে শত ত্যাগ ও মুজাহাদার বিনিময়ে নিজ হজকে হজ্জে মাবরূরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা। হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান হলো জান্নাত। তাই এই সফরে কিছু বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া অতীব জরুরি।

প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা। প্রতিটি মুহূর্তকে ইবাদতে পরিণত করা। দু'আ ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা ও গোনাহ ক্ষমা করিয়ে নিজেকে পূত পবিত্র করার চেষ্টা করা।

নিয়্যাতকে সহীহ করা। যেকোনো আমলের জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যাত আবশ্যক। তবে হজের ক্ষেত্রে তা আরো অধিক গুরুত্ব বহন করে। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজের সময় বলতেন–

اللهُمَّ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ

অর্থাৎ, আল্লাহ! এই হজকে এমন হজ হিসেবে কবুল করুন, যাতে রিয়া ও খ্যাতির ইচ্ছা নেই।

তাই হজে কিংবা আগে-পরে এমন কোনো কাজ না করা, যার মধ্যে রিয়া, লোকদেখানো এবং খ্যাতি অর্জনের সামান্যতম উদ্দেশ্য জড়িত থাকে। বরং সকল কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা।

হজের মাসায়েল শিক্ষা করা। হজের প্রকার জেনে কোন হজ করবেন, তার নিয়্যাত করা। এতদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় আহকাম ও মাসায়েল ভালোভাবে জেনে নেওয়া খুবই জরুরি।

হজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে যেন পুরো হজ সলফে সালেহীনের বাতলানো পন্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হজের মতো হয়। সকল স্থানে, সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করা হলে ইনশাআল্লাহ হজ মকবুল এবং মাবরূর হজে রূপান্তরিত হবে।

হজের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট দু'আ রয়েছে। কখন কোন দু'আ কিভাবে পড়তে হবে, তা জেনে নেওয়া। আলেমদের কাছ থেকে এসব দু'আর শুদ্ধ উচ্চারণসহ শিখে নেওয়া।

সব সময় মসজিদে হারামে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা। সম্ভব হলে সামনের কাতারে নামায আদায় করা। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে সামনের কাতারে নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে উঠবে, যা বড়ই ফজীলতপূর্ণ কাজ।

হারামাইন শরীফাইনে সকল মাযহাবের মানুষ একত্রিত হন। যার কারণে এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই আমল বিভিন্ন পন্থায় পালন করতে দেখা যায়। তাই ব্যতিক্রম কিছু আমল দেখে এ কথা ভাবার কোনোই কারণ নেই যে দেশে যা করেছিলেন, তা ভুল ছিল। দেশে ফিরে আপনাকেও এগুলো করতে হবে। বরং এসব বিষয়ে বুঝতে চাইলে আলেমদের কাছ থেকে ধারণা নেওয়া যাবে।

অপ্রয়োজনে প্রাণীর ছবি তোলা হারাম। কিন্তু বর্তমান যুগে সেলফিসহ বিভিন্নভাবে ছবি তোলা মহামারির রূপ নিয়েছে। হজের সফরেও অনেকের বেলায় এই হারাম কাজটি করতে দেখা যায় অনায়াসেই। ছবি সম্পর্কে হাদীস শরীফে কঠোর শতর্কবাণী এসেছে। আল্লাহ না করুন, ছবির কারণে যেন পুরো হজটাই নষ্ট হয়ে না যায়।

শপিং বা এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরিতে বেশি সময় নষ্ট না করা। এত ক্লান্তি স্বীকার করে যে উদ্দেশ্যে সফর করা হয়েছে, তা সঠিকভাবে অর্জিত হওয়ার মানসে নিজেকে সব সময় ইবাদত ও যিকির-আযকারে মশগুল রাখাই উচিত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ আদায় করে এবং সেখানে যাবতীয় মন্দকাজ ও কথা থেকে বিরত থাকে, সে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের মতো গোনাহমুক্ত হয়ে ফিরবে। (বোখারী ১৪২৪)

এই কারণে হজ-পরবর্তী সময়ে হাজী সাহেবদের নেক আমল বেশি বেশি করা, সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর ওপর জীবন পরিচালনার জন্য অবিরাম চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। হজের মাধ্যমে নিজের গোনাহসমূহ মাফ করানোর পর সামনের জীবনে গোনাহমুক্ত হায়াত কিভাবে অর্জন করা যায়, সে চেষ্টা করা। এর জন্য প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণকে নিজের জন্য আবশ্যক হিসেবে গ্রহণ করা। সুন্নাতে রাসূলের ওপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, ইনশাআল্লাহ সামনের জীবনটি গোনাহমুক্ত করা সহজ হয়ে যাবে এবং পুণ্য করার মাধ্যমে নিজের আমলনামায় সওয়াবের বিশাল অর্জন যুক্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে হজ্জে মাবরূর নসীব করুন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা
২৯/০৬/২০১৮ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٤٦)

(৪৫) এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, অবশ্যই ওটা কঠিন; কিন্তু বিনীতগণের পক্ষে নয়। (৪৬) যারা ধারনা করে যে নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সম্মিলিত হবে এবং তারা তাঁরই দিকে প্রতিগমন করবে। (বাকারা)

এই আয়াতে মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

কর্তব্য পালন করতে এবং নামায পড়তে বলা হয়েছে। রোযা রাখাও হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা। এ জন্যই রমাজান মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, রোযা অর্ধেক ধৈর্য। ধৈর্যের ভাবার্থ পাপের কাজ হতে বিরত থাকাও বটে। এ আয়াতে যদি ধৈর্যের ভাবার্থ এটাই হয়ে থাকে তবে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা ও পুণ্যের কাজ করা এ দুটিরই বর্ণনা হয়ে গেছে। পুণ্যের কার্যসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে নামায। হযরত উমর (রা.) বলেন, ধৈর্য দুই প্রকার। ১. বিপদের সময় ধৈর্য। ২. পাপের কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য। দ্বিতীয় ধৈর্য প্রথম ধৈর্য হতে উত্তম। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা.) বলেন, প্রতিটি জিনিস আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। মানুষের এটা স্বীকার করা, পুণ্য প্রার্থনা করা এবং বিপদের প্রতিদানের ভাণ্ডার আল্লাহর নিকটে আছে–এ মনে করার নাম ধৈর্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ধৈর্যধারণ করলেও আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা হয়। পুণ্যের কাজের নামায দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

স্বয়ং কোরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত করো, নিশ্চয়ই এ নামায সমুদয় নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে, আর আল্লাহর স্মরণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম বস্তু। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখনই কোনো কঠিন ও চিন্তাযুক্ত কাজের সম্মুখীন হতেন, তখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

খন্দকের যুদ্ধে রাতেরবেলায় হযরত হুযায়ফা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে হাজির হলে তাঁকে নামাযে দেখতে পান। হযরত আলী (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের রাতে আমরা সবাই শুয়ে গেছি, আর দেখি যে রাসূলুল্লাহ (সা.) সারা রাত নামাযে রয়েছেন। সকাল পর্যন্ত তিনি নামায ও প্রার্থনায় লেগে রয়েছেন। তাফসীরে ইবনে জারীরে আছে যে নবী করীম (সা.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে দেখতে পান যে তিনি ক্ষুধার জ্বালায় পেটের ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি ফার্সি ভাষায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, اشكم درد অর্থাৎ তোমার পেটে কি ব্যথা আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ওঠো, নামায আরম্ভ করো, এতে রোগমুক্তি রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সফরে তাঁর ভাইয়ের (রা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে انا لله وانا اليه راجعون পাঠকরত পথের এক ধারে সরে গিয়ে উটকে বসিয়ে দেন এবং নামায শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ নামায পড়ার পর সওয়ারীর নিকট আসেন এবং এই আয়াত দুটি পড়তে থাকেন। মোটকথা, ধৈর্য ও নামায এ দুটি দ্বারা আল্লাহর করুণা লাভ করা যায়।

انها এর ها সর্বনামটি কেউ কেউ বলেছেন, صلوٰة এর দিকে ফিরেছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে এর مرجع হচ্ছে مدلول অর্থাৎ وصيت শব্দটি। যেমন কারুনের ঘটনায় ولا يلقاها الكلام এর ها সর্বনামটি এবং মন্দের বিনিময়ে ভালো করার হুকুমে وما يلقاها এর ها সর্বনামটি। ভাবার্থ এই যে ধৈর্য ও নামায এ দুটি প্রত্যেকের সাধ্যের মধ্যে নয়। এ অংশ হচ্ছে ওই দলের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে থাকে। অর্থাৎ কোরআনকে মান্যকারী সত্য মুমিন, বিনয়ী, আনুগত্য স্বীকারকারী এবং জান্নাতের অঙ্গীকার ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীগণই এ বিশেষণে বিশেষিত হবে। যেমন–হাদীসে আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, এটা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু যার ওপরে আল্লাহর অনুগ্রহ হয়, তার জন্য সহজ। ইবনে জারীর (রহ.) আয়াতটির অর্থ করতে গিয়ে বলেন, এটাও ইহুদিদের লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট কথা এই যে বর্ণনাটি তাদের জন্য হলেও আদেশ হিসেবে সর্বব্যাপী।

বিনয়ীগণ : সামনে গিয়ে خاشعين এর বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে ধারণা অর্থ বিশ্বাস, যদিও এটা সন্দেহের অর্থেও এসে থাকে। যেমন– سدفة শব্দটি অন্ধকারের অর্থেও আসে এবং আলোর অর্থেও আসে। অনুরূপভাবে صداخ শব্দটি অভিযোগকারী ও অভিযোগের প্রতিকারকারী উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ রকম আরো বহু শব্দ আছে, যেগুলো দুটি ভিন্ন জিনিসের ওপর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ظن শব্দটি يقين অর্থে ব্যবহার আরব কবিদের কবিতায়ও দেখা যায়। স্বয়ং কোরআন মজীদেরই অন্য স্থানে আছে–

ورأ المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها

অর্থাৎ পাপীরা জাহান্নাম দেখে বিশ্বাস করে নেবে যে নিশ্চয়ই তারা তার মধ্যে পতিত হয়ে যাবে। এখানেও ظن শব্দটি يقين অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, কোরআন মজীদের মধ্যে এ রকম প্রত্যেক জায়গাতে ظن শব্দটি يقين এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবু আলিয়াও (রহ.) এখানে ظن এর অর্থ يقين করে থাকেন। হযরত মুজাহিদ (রহ.), সুদ্দী (রহ.), রাবী বিন আনাস (রহ.) কাতাদা (রহ.)-এর মতও এটি। ইবনে জুরাইযও (রহ.) এ কথাই বলেন। কোরআন মজীদের অন্য জায়গায় আছে : ظننت انى ملاق حسابيه অর্থাৎ আমার বিশ্বাস ছিল যে আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

একটি হাদীসে আছে যে কিয়ামতের দিন এক পাপীকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কি তোমাকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিইনি? তোমার প্রতি নানা প্রকারের অনুগ্রহ করিনি, ঘোড়া ও উটকে কি তোমার অধীন করিনি? তোমাকে কি শান্তি, আরাম, আহার্য ও পানীয় দিইনি? সে বলবে–হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রভু! এ সব কিছুই ছিল। তখন আল্লাহ বলবেন, তবে তোমার কি এই জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল না যে তোমাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে? সে বলবে–হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রভু! এর প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল। আল্লাহ বলবেন, তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, তেমনই আমিও তোমাকে ভুলে গেলাম। এ হাদীসেও ظن শব্দটি এসেছে এবং يقين এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর অবলম্বনে)

মুসলিম দুনিয়ায় সর্বাধিক পঠিত অন্যতম কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪৩

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জামা'আত ত্যাগ করার শাস্তি

হাদীস নং-১।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ مَغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ، عُذْرٌ، قَالُوا :وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى عَنْ مَغْرَاءَ أَبُو إِسْحَاقَ

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে কোনো রকম ওজর ব্যতীত জামা'আতে হাজির হয় না, তার নামায কবুল হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ওজর বলতে কী বোঝায়? ইরশাদ করেন, অসুস্থতা বা ভয়-ভীতি।

(আবু দাউদ শরীফ ১/৩৭৩ হা. ৫৫১, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৭৩৫ হা. ৭৯৩, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫/৪১৫ হা. ২০২৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২৪৬ হা. ৮৯৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/১৯৪ হা. ৩৪৮৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে এই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করেছে।

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبا أَبُو مُحَمَّد بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ :وَأَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ " :إِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَمَنْ سَمِعَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ

(আস সুনানুল কুবরা [বায়হাকী] ৩/১৭৩ হা. ৫৫৮৩)

হাদীসটির মান : হাসান

খ. হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনে জামা'আতে শরীক হয় না সে নিজেও মঙ্গল কামনা করেনি এবং তার সাথেও মঙ্গল কামনা করা হয়নি।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْ لَمْ يُرِدْ خَيْرًا، أَوْ لَمْ يُرَدْ بِهِ

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩৪৩ হা. ৩৪৮৫, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১/৪৯৮ হা. ১৯১৭, আসসুনানুল কুবরা ৩/৫৭ হা. ৪৯৪১)

হাদীসটির মান : সহীহ

গ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে জামা'আতে শরীক হলো না তার কান গলিত সিসা দ্বারা ভরে দেওয়া উত্তম।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :لَأَنْ يَمْتَلِئَ أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَا يُجِيبُهُ

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/১৯৪ হা. ৩৪৮৪)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-২।

حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَايِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ، وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ :مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللهِ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ وَيَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ فَلَا يُجِيبُهُ

وفي رواية :عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :(مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يسمع الرَّجُلُ بِدَاعِي اللَّهِ يُنَادِي

بالصّلاة ثُمَّ لا يُجيبَ
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তির কাজে একেবারে জুলুম, কুফর এবং মুনাফেকী যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর (মুআযযিনের) ডাক শুনেও মসজিদে হাজির হয় না।
(মুসনাদে আহমদ ৩/৪৩৯ হা. ১৫৬২৭, আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] ২০/১৮৩ হা. ৩৯৪)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ. হযরত সুলাইমান ইবনে আবী আসমা (রা.) খুবই উঁচু মর্তবার সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যামানায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প বয়স হওয়ার কারণে তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ হয়নি। হযরত উমর (রা.) তাঁকে বাজারের তদারকি কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি ফজরের জামা'আতে শরীক হতে পারেননি। হযরত উমর (রা.) খবর নেওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুলাইমান আজ ফজরের নামাযে হাজির হয়নি কেন? তাঁর মা বললেন, সারা রাত নফল নামাযে মশগুল ছিল, তাই ঘুমের চাপে চোখ লেগে গিয়েছে। হযরত উমর (রা.) বললেন, রাতভর নফল পড়া অপেক্ষা ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِى حَثْمَةَ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ، وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ ,فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ :لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِى الصُّبْحِ، فَقَالَتْ :إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّى، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً.
(মুআত্তা ইমাম মলেক ১/১৩৯, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১/৫২৬ হা. ২০১১)
হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-৩।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِى فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتِىَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِى بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার ইচ্ছা হয় কিছুসংখ্যক যুবককে অনেকগুলো জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আনতে বলি। অতঃপর আমি ওই সব লোকের নিকট যাই, যারা বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়ে নেয় এবং গিয়ে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিই।
(নাসাঈ শরীফ ১/১৩৫ হা. ৮৪৮, আবু দাউদ শরীফ ১/৮০ হা. ৫৪৭, সহীহে ইবনে খুযাইমা ২/৩৭১ হা. ১৪৮৬, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫/৪৫৭ হা. ২১০১, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২৪৬ হা. ৯০০, মুসনাদে আহমদ ৫/১৯৬ হা. ২১৭১০)
হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-৪।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِى زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنِى السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلاَعِىُّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمَرِىِّ، قَالَ: قَالَ لِى أَبُو الدَّرْدَاءِ :أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قَالَ :قُلْتُ :فِى قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِى قَرْيَةٍ لاَ يُؤَذَّنُ وَلاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে গ্রামে বা মাঠে কমপক্ষে তিনজন লোক থাকে আর সেখানে জামা'আতের সাথে নামায পড়া হয় না, তাদের ওপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। কাজেই জামা'আতকে জরুরি মনে করো। দল ত্যাগকারী ছাগলকে বাঘে খেয়ে ফেলে। আর মানুষের বাঘ হলো শয়তান।
(নাসাঈ শরীফ ১/১৩৫ হা. ৮৪৮, আবু দাউদ শরীফ ১/৮০ হা. ৫৪৭, সহীহে ইবনে খুযাইমা ২/৩৭১ হা. ১৪৮৬, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫/৪৫৭ হা. ২১০১, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২৪৬ হা. ৯০০, মুসনাদে আহমদ ৫/১৯৬ হা. ২১৭১০)
হাদীসটির মান : সহীহ
ক. এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন কোনো রাখাল কোনো পাহাড়ের পাদদেশে অথবা মাঠে আযান দিয়ে নামায পড়তে আরম্ভ করে তখন আল্লাহ তা'আলা খুবই খুশি হন এবং গর্ব করে ফেরেশতাদের বলেন–তোমরা দেখো, আমার বান্দা আযান দিয়ে নামায আদায় করতে আরম্ভ করেছে, আমার ভয়েই সে এসব করছে, আমি তাকে মাফ করে দিলাম এবং তার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিলাম।

أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ" :يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ وَيُصَلِّى فَيَقُولُ اللَّهُ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلاَةِ يَخَافُ مِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَأَدْخَلْتُهُ الجنة
(নাসাঈ শরীফ ১/১০৮, হা. ৬৬৭, আবু দাউদ শরীফ ১/১৭০ হা. ১২০৩, সহীহে ইবনে হিব্বান ৪/৫৪৫ হা. ১৬৬০, মুসনাদে আহমদ ৪/১৫৮ হা. ১৭৪৪৩)
হাদীসটির মান : সহীহ

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

হজ ও উমরা

তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

হজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কারো তাওফীক হলে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে হজের মাসায়েল ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে সাধারণ লোক তো বটেই, এমনকি অনেক জানাশোনা লোকও বিভ্রান্তির শিকার হন। সে কারণে হজের পূর্বে এবং হজে থাকাকালীন হজের বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। সাধারণের পক্ষে হজসংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব নির্বাচন করা মুশকিল। কারণ বাজারে নির্ভরযোগ্য অনেক বই যেমন পাওয়া যায়, তেমনি হজ সম্পর্কে অনির্ভরযোগ্য বইয়েরও অভাব নেই। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ফিকহ গ্রন্থের আলোকে হজের ফজীলত ও প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো।

হজের ফরযিয়্যাত :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

আর এ ঘরের হজ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না, আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না। (আলে ইমরান ৯৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ আদায় করে এবং সেখানে যাবতীয় মন্দকাজ ও কথা থেকে বিরত থাকে সে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের মতো গোনাহমুক্ত হয়ে ফিরবে। (বোখারী ১৪২৪)

হজের অর্থ :

আভিধানিক অর্থ : মক্কা শরীফের ইচ্ছা করা। (আততা'রীফাত)

শরয়ী অর্থ : নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট স্থানের জিয়ারত করা। (আততা'রীফাত ১/২৬)

হজ ফরয হওয়ার ব্যাপারে পুরো উম্মত একমত। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

হজের শর্তসমূহ :

১। হজ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ :

নিম্নোল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে প্রত্যেক নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ ফরয হয়। (বোখারী ১৪২৪, মুসলিম ২৩৮০)

১। মুসলমান হওয়া। অমুসলিমের ওপর হজ ফরয নয়। (বোখারী ৩৫৬)

২। বালেগ হওয়া। নাবালেগের ওপর হজ ফরয নয়। (বোখারী ১৬/৩১৫ বায়হাকী ১০১৩৩)

৩। আকলওয়ালা তথা বোধসম্পন্ন হওয়া। নির্বোধ পাগলের ওপর হজ ফরয নয়। (বোখারী ১৬/৩১৫)

৪। আযাদ হওয়া, গোলামের ওপর হজ ফরয নয়। (আলে ইমরান ৯৭, বায়হাকী ১০১৩৩)

৫। সামর্থ্যবান হওয়া।

সামর্থ্যবান হওয়ার অর্থ হলো, নিজের অনুপস্থিতিতে পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা এবং যাতায়াত ও পাথেয়ের মালিক হওয়া। (তিরমিযী হা. ৭৪১) যদি নিজ খরচে যাওয়ার মতো মাহরাম না থাকে তবে নারীদের ক্ষেত্রে নিজের এবং একজন মাহরামের হজে যাওয়া-আসা ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ বহনে সামর্থ্যবান হতে হবে।

৬। হজের সময়ের আগমন।

২। হজ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ :

কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হওয়ার পর নিজে হজ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো। এ সকল শর্ত পাওয়া না গেলে নিজে হজ করা ওয়াজিব হবে না। বরং অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ বদলি হজ করাতে হবে অথবা বদলি হজ করানোর জন্য অসিয়ত করতে হবে।

১। শারীরিকভাবে হজ করতে সক্ষম হওয়া। (বায়হাকী ৮৯২২)

২। হজে গমনে প্রতিবন্ধকতা না থাকা। যেমন–কয়েদি বা পরাধীন ব্যক্তি। (বায়হাকী ৮৯২২)

৩। রাস্তার নিরাপত্তা থাকা। (সুনানে কুবরা ৮৯২২)

৪। নারী যুবতী হোক বা বৃদ্ধা তার সাথে স্বামী বা অন্য কোনো মাহরাম থাকা। (বোখারী ১০২৪, দারা কুতনী ২৪৬৭)

৫। মহিলা তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর

কারণে ইদ্দত অবস্থায় না হওয়া। (সূরায়ে তালাক ১)

৩। হজ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ :

নিম্নোল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া না গেলে হজ আদায় সহীহ হবে না।

১। ইহরাম তথা হজের নিয়্যাত করা। সুতরাং ইহরাম বাঁধা ছাড়া হজ আদায় সহীহ হবে না। (বোখারী ১)

ইহরামের নিয়ম হলো, মীকাত থেকে তালবিয়া পড়ার মাধ্যমে হজের নিয়্যাত করা। পুরুষরা ইহরামের সময় সেলাই করা কাপড় খুলে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করবে। (বোখারী ১৭০৭)

নারীরা স্বাভাবিক কাপড় পরবে। তবে নেকাব বা অন্য কোনো কাপড় চেহারার সাথে লেগে থাকতে পারবে না।

তালবিয়া এভাবে পড়বে :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ،لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ،اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ.

(বোখারী ১৪৪৮)

২। সময়। সুতরাং হজের নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে হজ আদায় সহীহ হবে না। (বাকারা ১৯৭)

মাসআলা : হজের মাস হলো ১। শাওয়াল, ২। জিলকদ ও ৩। জিলহজের প্রথম ১০ দিন। সুতরাং এ সময়ের আগে হজের তাওয়াফ বা সাঈ করলে সহীহ হবে না। হজের মাসের আগে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। (বোখারী ৫/৪৬১)

৩। নির্দিষ্ট স্থান। অর্থাৎ আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, তাওয়াফে জিয়ারত বায়তুল্লাহ শরীফে করা, রমী মীনাতে করা এবং পশু কোরবানী হারাম শরীফে করা।

যদি সময়মতো আরাফায় অবস্থান না করা হয় তবে হজ সহীহ হবে না। (নাসাঈ ২৯৬৬, সূরায়ে হজ ২৯)

ইহরাম বাঁধার মীকাত :

হজ বা উমরা পালনোদ্দেশ্যে রওনাকারীগণের জন্য ইহরাম বাঁধা ছাড়া যে সকল নির্ধারিত স্থান অতিক্রম করা নাজায়েয সে স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়। (আউনুল মাবূদ ৪/১৩৯)

দিক ভিন্নতার কারণে মীকাতও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন–ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মীকাত হলো 'ইয়ালামলাম'। মিসর, সিরিয়া এবং পশ্চিমাদের মীকাত হলো 'জুহফা'। ইরাক ইত্যাদি দেশের মীকাত হলো 'যাতে ইরক'। মদীনা শরীফের দিক থেকে আগন্তুকদের জন্য 'যুল হুলাইফা' এবং নজদবাসীর মীকাত হলো 'করন'। মোটকথা হল, যে যেদিক থেকে আসবে মীকাতের আগে ইহরাম বেঁধে মীকাত অতিক্রম করতে হবে। ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই।

মক্কাবাসী বা হুদুদে অবস্থানকারীদের হজের মীকাত মক্কা আর উমরার মীকাত 'হিল'। যে সকল লোক 'হিল' (মীকাত এবং হুদুদে হেরমের মধ্যবর্তী স্থান)-এ অবস্থান করছে তারা হুদুদে প্রবেশের পূর্বে ইহরাম বাঁধবে। (বোখারী ১৪২৭)

হজের ফরযসমূহ :

হজের ফরয তিনটি।

১। ইহরাম বাঁধা। (সুনানে কুবরা ৯১৯০)

২। জিলহজ মাসের ৯ (নবম) তারিখ সূর্য হেলার পর থেকে ঈদুল আজহার দিন সুবহে সাদিক পর্যন্তের যেকোনো সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। এই সময়ের মধ্যে অতি অল্প সময়ও আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। (তিরমিযী ৮১৪)

৩। আরাফায় অবস্থানের পর কা'বা শরীফে সাত চক্কর লাগানো। যাকে তাওয়াফে জিয়ারত বা তাওয়াফে এফাযা বলা হয়।

হজের ওয়াজিবসমূহ :

১। সামান্য সময়ের জন্য হলেও মুযদালাফায় অবস্থান করা। এর সময় হলো জিলহজের ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। (সূরায়ে বাকারা ১৯৮, তিরমিযী ৮১৫)

২। সাফা-মারওয়ায় সাত চক্কর লাগানো। যাকে সাঈ বলা হয়। চক্কর লাগানো আরম্ভ হবে সাফা থেকে আর শেষ হবে মারওয়ায়। (দারাকুতনী ২৬১৫, মুসলিম ২১৩৭)

৩। যথাসময়ে রমী করা। (শয়তানকে পাথর মারা) (মুসলিম ২২৮৬)

৪। তামাত্তু ও কেরান হজকারীগণ দমে শোকর তথা হজের কোরবানী করা।

৫। হারামে কোরবানীর দিনসমূহে মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা। (মুসলিম ২২৯৮, বোখারী ১৬১৩)

৬। মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যদের তাওয়াফে সদর তথা তাওয়াফে 'বিদা' করা। (মুসলিম ২৩৫০)

উল্লেখ্য, এই ছয়টি হলো হজের ওয়াজিব। হজের আমলসমূহে আরো কিছু ওয়াজিব রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ।

১। ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে জিয়ারত (ফরয তাওয়াফ) সম্পন্ন করা। (মুসলিম ২৩০৭, সুনানে কুবরা ৯৯২৮)

২। সূর্য হেলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। (মুসলিম)

৩। তাওয়াফ অবস্থায় (হাদসে আকবার ও আসগার তথা ওজু বা গোসল ফরয হয়, এমন অবস্থা থেকে) পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকা। (নাসাঈ ২৮৭৩, মুসলিম ২১৭৩)

৪। প্রত্যেক তাওয়াফের পর দুই রাক'আত নামায আদায় করা। (বোখারী ১৫১১)

৫। কেরান ও তামাত্তু হজকারী তারতীব বজায় রেখে তিনটি কাজ করা (ক) রমী, (খ) কোরবানী এবং (গ) হলক। (সহীহ

মুসলিম ১৯৮, উমদাতুল কারী ১০/৫৮)
৬। সতর ঢাকা। (বোখারী)
৭। তাওয়াফের সূচনা হজরে আসওয়াদ থেকে করা। (দারাকুতনী ২/২৮৯, মুসলিম ৮/১৭৪, মারাকিল ফালাহ ৭২৯)

হজের সুন্নাতসমূহ :

১। ইহরাম বাঁধার সময় গোসল বা ওজু করা এবং শরীরে খোশবু মাখা। (তিরমিযী ৭৬০, মুসলিম ৮/১০১)
২। নতুন বা পরিষ্কার চাদর পরা। সাদা হওয়া উত্তম (মুসনাদে আহমদ ৪৮৯৯, তিরমিযী ৯১৫,২৭২৩)
৩। ইহরাম বাঁধার পূর্বে দুই রাক'আত নামায আদায় করা। (মুসলিম ২০৩১)
৪। বেশি বেশি তালবিয়া পড়া। (মুসলিম ২২৪৬)
৫। মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যরা হজে ইফরাদ বা কেরান করা কালীন তাওয়াফে কুদুম করা। (মুসলিম ২১৩৯)
৬। মক্কায় থাকাকালীন বেশি বেশি তাওয়াফ করা। (তিরমিযী ৭৯৪)
৭। 'ইযতিবা' করা। অর্থাৎ তাওয়াফ আরম্ভ করার আগে চাদরের একদিককে নিজের ডান বাহুর নিচে রাখা এবং অপর দিককে বাম কাঁধের ওপর পেঁচিয়ে দেওয়া। (তিরমিযী ৭৮৭)
৮। তাওয়াফের সময় 'রমল' করা। রমলের পদ্ধতি হলো তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করের সময় ঘন ঘন কদম ফেলা এবং উভয় কাঁধ হেলাতে হেলাতে চলা। (বোখারী ১৫০১) (উল্লেখ্য, 'রমল' ও 'ইজতিবা' ওই তওয়াফে সুন্নাত যে তাওয়াফের পরে সাঈ করা হয়)
৯। সাঈ করার সময় উভয় মীলাইনে আখযারাইনের (সবুজ বাতি) মধ্যখানে জোরে হাঁটা (পুরুষদের জন্য)। (মুসলিম ২১৩৭)
১০। তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া। (চুমু দেওয়া সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত উঁচিয়ে ইশারা করে হাতে চুমু দেওয়া)। (আবু দাউদ ১৬০০, বোখারী ১৫০৬, ১৫০৭)
১১। কোরবানীর দিনসমূহে মীনাতে রাত যাপন করা। (আবু দাউদ ১৬৮৩)

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ :

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মুহরিমের জন্য নাজায়েয। এ সকল কাজ থেকে মুহরিমদের বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক, যাতে হজ নষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ না হয়।
১। ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস বা এরূপ কাজে আকৃষ্টকারী কোনো কাজ করা। (সূরা বাকারা ১৯৮, রূহুল মাআনী ২/১৬৪)
২। কোনো প্রকার হারাম কাজ করা। (গ্রাগুক্ত)
৩। গালমন্দ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া। (গ্রাগুক্ত)
৪। খোশবু ব্যবহার করা। যেমন–আতর, গোলাপ, জাফরান ইত্যাদি। (বোখারী ১৭০৭, ১৭০৮, মুসলিম ২০১৮)
৫। পুরুষরা সেলাইকৃত বস্ত্র পরা। যেমন–কোর্তা, পায়জামা, পাঞ্জাবি, জুব্বা, মোজা ইত্যাদি। সেরূপ মাথা বা মুখ ঢেকে রাখার কাপড়চোপড়। (প্রাগুক্ত)
৬। নখ, মাথার চুল, দাড়ি এবং নাভির নিচের কেশ ইত্যাদি কর্তন করা। (বাকারা ১৯৬, আলফিকহুল ইসলামী ৩/৬০৩)
৭। চুল বা (কেশ এবং) শরীরের কোনো অঙ্গে ঘ্রাণযুক্ত তেল লাগানো। (বোখারী ৪৯১৮, বাদায়ে ৫/১৩০)
৮। হুদুদে হারামে গাছ বা ঘাস ইত্যাদি কর্তন করা। হুদুদে হারামে এই কাজ সর্বাবস্থায় হারাম। (বোখারী ১৪৮৪)
৯। স্থলের কোনো বন্য প্রাণী শিকার করা। উক্ত প্রাণী খাওয়া জায়েয হোক বা নাজায়েয। (বাকারা ১৯৭, মায়েদা ৯৬, তিরমিযী ৭৭৫, বোখারী ১৭০৭ ইত্যাদি)

উমরা :

হজ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার জন্য পুরো জীবনে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (মুসনাদে আহমদ ১৪৪৩)
পুরো বছরই উমরা করা যায়। তবে আরাফার দিন, কোরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনসমূহে উমরার ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/৪৮৫)
উমরার কাজ হলো চারটি : দুটি ফরয, দুটি ওয়াজিব।

উমরার ফরয দুটি :

১। ইহরাম বাঁধা। (বোখারী ১)
২। তাওয়াফ করা। (বোখারী ১৪৬৬)

উমরার ওয়াজিব দুটি :

১। সাফা-মারওয়ার সাঈ করা। (প্রাগুক্ত)
২। মাথা মুণ্ডানো বা চুল কর্তন করে ছোট করা। (বোখারী ১৬১৩)

উমরা আদায়ের পদ্ধতি :

মক্কার নাগরিক বা অবস্থানরত লোক হিল (হারামের সীমানার বাইরে মীকাতের ভেতরের স্থান) থেকে আর মক্কার বাইরে থেকে আগন্তুক ব্যক্তি মীকাত থেকে উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ, সাফা মারওয়া সাঈ করবে এবং মাথা মুণ্ডাবে বা ছোট করবে। (বোখারী ১৪৫৯, মুসলিম ২০৩০)

হজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি :

হজ তিন প্রকার–তামাত্তু, কেরান ও ইফরাদ। এখানে প্রথমে হজে তামাত্তুর আলোচনা। এরপর বাকি দুই প্রকারের আলোচনা করা হবে।

হজে তামাত্তু

হজের মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ) উমরার নিয়্যাতে ইহরাম করে, উমরা পালন করে হালাল হওয়ার পর হজের নিয়্যাত করে নতুন ইহরামে হজ পালন করাকে হজে তামাত্তু বলে।

১. উমরার ইহরাম (ফরয)

প্রথমেই জেনে নিন আপনার গন্তব্য ঢাকা থেকে মক্কা শরীফ নাকি মদীনা শরীফ? যদি মদীনা শরীফ হয়, তাহলে এখন ইহরাম বাঁধতে হবে না; যখন মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ যাবেন, তখন ইহরাম বাঁধতে হবে। বেশির ভাগ হজযাত্রী আগে মক্কায় যান। এ ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে বিমানে ওঠার আগে ইহরাম বাঁধা ভালো। কারণ, জেদ্দা পৌঁছার আগেই 'ইয়ালামলাম' মীকাত বা ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানটি পড়ে। বিমানে যদিও ইহরাম বাঁধার কথা বলা হয়, কিন্তু ওই সময় অনেকে ঘুমিয়ে থাকেন; আর বিমানে পোশাক পরিবর্তন করাটাও দৃষ্টিকটু।

মনে রাখবেন, ইহরামের কাপড় পরিধান করলেই ইহরাম বাঁধা হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়্যাত করে 'তালবিয়া' তথা "লাব্বাইক....." পড়া না হয়। তাই ইহরামের কাপড় পরিধানের পর সতর্কতামূলক বিমান ছাড়ার পর নিয়্যাত করে তালবিয়া আরম্ভ করা ভালো। বিনা ইহরামে মীকাত পার হলে এ জন্য দম দিতে হবে। তদুপরি গোনাহ হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সেরে গোসল বা ওজু করে নিন।

মীকাত অতিক্রমের আগেই সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন, আরেকটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ইহরামের নিয়্যাতে দুই রাক'আত নামায পড়ে নিন।

শুধু উমরার নিয়্যাত করে এক বা তিনবার তালবিয়া পড়ে নিন।

ইহরামের নিয়্যাতের সময় বলুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَالِیْ وَتَقَبَّلْهامِنِّی

এরপর তালবিয়া এভাবে পড়ুন :

لَبَّيْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْکَ،لَبَّيْکَ لاشَرِيْکَ لَکَ لَبَّيْکَ،اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ لاشَرِيْکَ لَکَ.

ঢাকা বিমানবন্দর

উড্ডয়নের সঠিক সময় অনুযায়ী বিমানবন্দরে পৌঁছান। আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ব্যাগ বা স্যুটকেসে কোনো পচনশীল খাবার রাখবেন না। বিমানবন্দরে লাগেজে যে মাল দেবেন, তা ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কি না, দেখে নেবেন।

বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র, পিলগ্রিম পাস, বিমানের টিকিট, টিকা দেওয়ার কার্ড, অন্য কাগজপত্র, টাকা, বিমানে পড়ার জন্য ধর্মীয় বই ইত্যাদি গলায় ঝোলানোর ব্যাগে সযত্নে রাখুন।

সময়মতো বিমানে উঠে নির্ধারিত আসনে বসুন।

জেদ্দা বিমানবন্দর :

মোয়াল্লিমের গাড়ি আপনাকে জেদ্দা থেকে মক্কায় যে বাড়িতে থাকবেন, সেখানে নামিয়ে দেবে। মোয়াল্লিমের নম্বর (আরবীতে লেখা) কবজি বেল্ট দেওয়া হবে, তা হাতে পরে নেবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র (যাতে পিলগ্রিম পাস নম্বর, নাম, ট্রাভেল এজেন্টের নাম ইত্যাদি থাকবে) গলায় ঝোলাবেন।

যানবাহনে ওঠানামার সময় ও চলার পথে বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন

لَبَّيْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْکَ،لَبَّيْکَ لاشَرِيْکَ لَکَ لَبَّيْکَ،اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ لاشَرِيْکَ لَکَ.

মক্কায় পৌঁছে :

মক্কায় পৌঁছে আপনার থাকার জায়গায় মালপত্র রেখে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম করুন। আর যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, নামায আদায় করুন। বিশ্রাম শেষে উমরার নিয়্যাত করে থাকলে উমরা পালন করুন।

মসজিদুল হারামে (কা'বা শরীফ) অনেকগুলো প্রবেশপথ আছে; সবকটি দেখতে একই রকম। কিন্তু প্রতিটি প্রবেশপথে আরবী ও ইংরেজিতে ১, ২, ৩ নম্বর ও প্রবেশপথের নাম আছে, যেমন–বাদশাহ আবদুল আজিজ প্রবেশপথ। আপনি আগে থেকে ঠিক করবেন, কোন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকবেন বা বের হবেন। আপনার সফরসঙ্গীকেও স্থান চিনিয়ে দিন। তিনি যদি হারিয়ে যান, তাহলে নির্দিষ্ট নম্বরের গেটের সামনে থাকবেন। এতে ভেতরে ভিড়ে হারিয়ে গেলেও নির্দিষ্ট স্থানে এসে সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন।

কা'বা শরীফে স্যান্ডেল রাখার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন, নির্দিষ্ট স্থান তথা জুতা রাখার জায়গায় রাখুন। এখানে-সেখানে জুতা রাখলে পরে আর খুঁজে পাবেন না। প্রতিটি জুতা রাখার র‍্যাকেও নম্বর দেওয়া আছে। এই নম্বর স্মরণ রাখুন।

উমরার নিয়ম-কানুন আগে জেনে নেবেন, যেমন–সাত চক্করে তাওয়াফ করা, জমজমের পানি পান করা, নামায আদায় করা, সাঈ করা (সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো–যদিও মসৃণ পথ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছোট করা–এসব কাজ ধারাবাহিকভাবে করা। ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় হয়ে গেলে ওই সময় নামায পড়ে আবার বাকিটুকু শেষ করা।

কা'বা শরীফ :

হারাম শরীফে প্রবেশ করার সময় এই দু'আ পড়া–

بِسْمِ اللهِ وَالصلاةُ والسَّلامُ عَلىٰ رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ

মসজিদুল হারামে পুরুষ কোনো নারীর পাশে অথবা তার সরাসরি পেছনে

দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে না।
কোনো দরজার সামনে নামায পড়া ঠিক নয়, এতে পথচারীর কষ্ট হয়।
হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সুন্নাত। তবে ভিড়ের কারণে না পারলে দূর থেকে চুমুর ইশারা করলেই চলবে। ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

২. উমরার তাওয়াফ (ফরয)

ওজুর সঙ্গে 'ইজতিবা'সহ তাওয়াফ করুন। ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নিচের দিক থেকে পেঁচিয়ে এনে বাঁ কাঁধের ওপর রাখাকে 'ইজতিবা' বলে।
হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তার বরাবর ডান পাশে দাঁড়ান। (ডান পাশে সবুজ বাতির প্রতি লক্ষ রেখে ঠিক করতে হবে) তারপর দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়্যাত করুন। তারপর ডানে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়াবেন, যেন হাজরে আসওয়াদ পুরোপুরি আপনার সামনে থাকে। এরপর দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ
لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَاللّٰـهُ اَكْبَـرُ اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقاً بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ

পড়ুন। পরে হাত ছেড়ে দিন এবং হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খেয়ে ডান দিকে চলতে থাকুন, যাতে পবিত্র কা'বাঘর পূর্ণ বাঁয়ে থাকে। পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করা সুন্নাত। 'রমল' অর্থ বীরের মতো বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন কদম ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা।
রুকনে ইয়ামানিকে সম্ভব হলে শুধু হাতে স্পর্শ করুন। রুকনে ইয়ামানিতে এলে এই দু'আ পাঠ করুন। তবে চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অতঃপর হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে চক্কর পুরো করুন।
পুনরায় হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খেয়ে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন। এভাবে সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করুন।
হাতে সাত দানার তাসবীহ অথবা গণনাযন্ত্র রাখতে পারেন। তাহলে সাত চক্কর ভুল হবে না।

৩. তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায (ওয়াজিব)

মাকামে ইবরাহীমের পেছনে বা হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের নিয়্যাতে (মাকরূহ সময় ছাড়া) দুই রাক'আত নামায পড়ে দু'আ করুন। মনে রাখবেন, এটা দু'আ কবুলের সময়।

৪. উমরার সাঈ (ওয়াজিব)

সাফা পাহাড়ের কিছুটা ওপরে উঠে (এখন আর পাহাড় নেই, মেঝেতে মার্বেল পাথর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সাঈর নিয়্যাত করে, দু'আর মতো করে হাত তুলে তিনবার তাকবির বলে দু'আ করুন। তারপর মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে দুই সবুজ দাগের মধ্যে (এটা সেই জায়গা, যেখানে হজরত হাজেরা (রা.) পানির জন্য দৌড়েছিলেন) একটু দ্রুত পথ চলে মারওয়ায় পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হলো। মারওয়া পাহাড়ে উঠে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে দু'আর মতো করে হাত তুলে তাকবীর পড়ুন এবং আগের মতো চলে সেখান থেকে সাফায় পৌঁছলে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হলো এভাবে সপ্তম চক্করে মারওয়ায় গিয়ে সাঈ শেষ করে দু'আ করুন।
সাঈ শেষে দুই রাক'আত নফল নামায পড়ুন। (মুস্তাহাব)

৫. হলক করা (ওয়াজিব)

পুরুষ হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণে সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করবেন। তবে মাথার চুল ছাঁটতেও পারেন। মহিলা হলে মাথার চুল এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন।
এ পর্যন্ত উমরার কাজ শেষ।
হজের ইহরাম না বাঁধা পর্যন্ত ইহরামের আগের মতো সব কাজ করতে পারবেন।

৬. হজের ইহরাম (ফরয)

হারাম শরীফ বা বাসা থেকে আগের নিয়মে শুধু হজের নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে ৮ জিলহজ জোহরের আগেই মীনায় পৌঁছে যাবেন। (যদি সম্ভব হয়)
নিয়্যাত করার সময় বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُالْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّى

৭. মীনায় অবস্থান (সুন্নাত)

৮ জিলহজ জোহর থেকে ৯ জিলহজ ফজরসহ মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায মীনায় আদায় করুন এবং এ সময়ে মীনায় অবস্থান করুন।

৮. আরাফার ময়দানে অবস্থান (ফরয)

আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের অন্যতম ফরয।
৯ জিলহজ দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করুন। এদিন নিজ তাঁবুতে জোহর ও আসরের নামায স্ব-স্ব সময়ে আলাদাভাবে আদায় করুন। মুকিম হলে চার রাক'আত পূর্ণ পড়ুন। মসজিদে নামিরায় উভয় নামায জামা'আতে পড়লে একসঙ্গে আদায় করতে পারেন, যদি ইমাম মুসাফির হন। আর মসজিদে নামিরা যদি আপনার তাঁবু থেকে দূরে থাকে, তাহলে নিজ স্থানে অবস্থান করবেন। মাগরিবের নামায না পড়ে মুযদালিফার দিকে রওনা হোন।

৯. মুযদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব) রাত যাপন (সুন্নাত)

আরাফায় সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় গিয়ে এশার সময়ে মাগরিব ও এশা এক

আযান ও এক ইকামতে একসঙ্গে আদায় করুন। (ওয়াজিব)

এখানেই রাত যাপন করুন (এটি সুন্নাত) এবং ১০ জিলহজ ফজরের পর সূর্যোদয়ের আগে কিছু সময় মুযদালিফায় অবশ্যই অবস্থান করুন (এটি ওয়াজিব)। তবে দুর্বল (অপারগ) ও নারীদের বেলায় এটা অপরিহার্য নয়। রাতে ছোট ছোট ছোলার দানার মতো ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করুন। মুযদালিফায় কঙ্কর খুব সহজেই পেয়ে যাবেন।

১০. কঙ্কর মারা (প্রথম দিন)

১০ জিলহজ সুবহে সাদিক থেকে ১১ জিলহজ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত শুধু বড় জামারাকে (বড় শয়তান) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)। যদি এই সময়ের মধ্যে কঙ্কর মারা না হয় তবে দম দিতে হবে।

১১. কোরবানী করা (ওয়াজিব)

১০ জিলহজ কঙ্কর মারার পরই কেবল দমে শোকর বা দমে তামাত্তু যাকে হজের কোরবানী বলা হয় নিশ্চিত পন্থায় আদায় করুন।

কোরবানীর পরেই কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণে মাথা হলক করুন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছোটও করতে পারেন।

খেয়াল রাখবেন : কঙ্কর মারা, কোরবানী করা ও চুল কাটার মধ্যে ধারাবাহিকতা জরুরি।

১২. তাওয়াফে জিয়ারত (ফরয)

১২ জিলহজ সূর্যাস্তের আগেই তাওয়াফে জিয়ারত করে নিতে হবে। তা না হলে ১২ জিলহজের পরে তাওয়াফটি করে দম দিতে হবে। তবে নারীরা ঋতুস্রাবের কারণে করতে না পারলে পবিত্র হওয়ার পরে করবেন। এতে দম দিতে হবে না। উল্লেখ্য, তাওয়াফে জিয়ারতের সাথে সাঈ করাও ওয়াজিব। তবে আরাফার পূর্বে কোনো নফল তাওয়াফের সাথে সাঈ করে থাকলে তাওয়াফে জিয়ারতের পরে সাঈ করতে হবে না।

১৩. কঙ্কর মারা (ওয়াজিব)

১১, ১২ তারিখে সূর্য হেলার পর থেকে পরদিন সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় জামরায় ৭টি করে ২১টি কঙ্কর প্রতিদিন নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। সূর্য হেলার পূর্বে নিক্ষেপ করলে আদায় হবে না, বরং সূর্য হেলার পর পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। অন্যথায় 'দম' দিতে হবে।

১৩ তারিখ সূর্য হেলার পর কঙ্কর নিক্ষেপকরত মীনা ত্যাগ করা সুন্নাত। তবে কেউ যদি ১২ তারিখে চলে আসতে চায় তাহলে ওই দিন সূর্য হেলার পর থেকে পরদিন সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো সময় পাথর মেরে চলে আসতে পারবে। যদি কেউ ১৩ জিলহজ সুবহে সাদিকের পর মীনায় অবস্থান করে তাহলে তার জন্য ১৩ তারিখও রমী করা ওয়াজিব। অন্যথায় দম দিতে হবে।

১৪. মীনা ত্যাগ

১৩ জিলহজ মীনায় না থাকতে চাইলে ১২ জিলহজ সন্ধ্যার আগে অথবা সন্ধ্যার পর ভোর হওয়ার আগে মীনা ত্যাগ করুন। সূর্যাস্তের আগে মীনা ত্যাগ করতেই হবে–এটা ঠিক নয়। তবে সূর্যাস্তের আগে মীনা ত্যাগ করা উত্তম।

১৫. বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)

বাংলাদেশ থেকে আগত হজযাত্রীদের হজ শেষে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হয় (ওয়াজিব)। তবে হজ শেষে যেকোনো নফল তাওয়াফই বিদায়ী তাওয়াফে পরিণত হয়ে যায়।

নারীদের মাসিকের কারণে বিদায়ী তাওয়াফ করতে না পারলে কোনো ক্ষতি নেই; দম দিতে হয় না।

১৬. মীনায় অবস্থানরত দিনগুলোতে (১০, ১১ জিলহজ) মীনাতেই রাত যাপন করুন। যদি ১৩ তারিখ রমি (কঙ্কর মারা) শেষ করে ফিরতে চান তবে ১২ তারিখ রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।

হজে কেরান :

হজের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে হজে কেরান। কেরান শব্দের আভিধানিক অর্থ : দুই বস্তুকে একত্রিত করা।

শরীয়তে হজে কেরান বলা হয় মীকাত থেকে হজ এবং উমরা উভয়টার একসাথে এহরাম বাঁধা।

উত্তম হজ হলো হজে কেরান তারপর তামাত্তু, তারপর ইফরাদ। (বোখারী ১৪৫৪, ১৪৬১, ১৪৬৬, ১৪৬০ সূরা বাকারা ১৯৬)

হজে কেরানের নিয়্যাতকারী এরূপ বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَالِىْ وَتَقَبَّلْهُمامِنِّىْ

অর্থ : আল্লাহ! আমি হজ এবং উমরার নিয়্যাত করেছি, উভয়টিকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং উভয়টি কবুল করো। (মুসলিম ২১৯৫)

হজে কেরান আদায়ের পদ্ধতি

১. ইহরাম বাঁধা (ফরয)।

মীকাত অতিক্রমের আগে একই নিয়মে ইহরাম করার কাজ সমাপ্ত করুন। তবে হজ ও উমরা উভয়ের নিয়্যাত একসঙ্গে করে তালবিয়া পড়ুন।

২. উমরার তাওয়াফ (পূর্বে বর্ণিত) নিয়মে আদায় করুন (ওয়াজিব)।

৩. উমরার সাঈ করুন, তবে এরপর মাথা মুণ্ডাবেন না বা চুল ছাঁটবেন না; বরং ইহরামের সব বিধি-বিধান মেনে চলুন (ওয়াজিব)।

৪. তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নাত)।

৫. আট জিলহজ জোহর থেকে ৯ জিলহজ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মীনাতে পড়ুন। এ সময়ে মীনাতে অবস্থান করুন (সুন্নাত)।

৬. আরাফার ময়দানে অবস্থান করুন (ফরয)।

৭. ৯ জিলহজ সূর্যাস্তের পর থেকে মুযদালিফায় অবস্থান এবং মাগরিব ও এশা একসঙ্গে এশার সময়ে আদায় করুন (ওয়াজিব)। তবে ১০ জিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান করুন (ওয়াজিব)।

৮. ওপরে বর্ণিত নিয়ম ও সময় অনুসারে ১০ জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

৯. দমে কেরান তথা হজের কোরবানী করুন (ওয়াজিব)।

১০. মাথার চুল মুণ্ডন করে নিন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন।

১১. তাওয়াফে জিয়ারত করুন (ফরয) এবং সাঈ করে নিন, যদি তাওয়াফে কুদুমের পরে না করে থাকেন।

১২. ১১, ১২ জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)। ১৩ জিলহজ কঙ্কর মারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ।

১৩. মীনায় থাকাকালীন মীনাতেই রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।

১৪. মীকাতের বাইরে থেকে আগত হাজিরা বিদায়ী তাওয়াফ করুন (ওয়াজিব)।

হজে ইফরাদ :

হজের তৃতীয় প্রকার হজে ইফরাদ। শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে হজ সম্পাদনকে হজে ইফরাদ বলে।

ইফরাদ হজ আদায়ের পদ্ধতি :

১. শুধু হজের নিয়্যাতে ইহরাম বাঁধুন (ফরয)। এরূপ বলুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُالْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّی

২. মক্কা শরীফ পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নাত)।

উল্লেখ্য, তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করলে তাওয়াফে জিয়ারতের পর সাঈ করার প্রয়োজন নেই।

৩. মীনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।

৪. আরাফার ময়দানে অবস্থান করুন (ফরয)।

৫. মুযদালিফায় রাত যাপন করুন (সুন্নাত)। তবে ১০ জিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান ওয়াজিব।

৬. ১০ জিলহজে জামারাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

৭. যেহেতু এ হজে দমে শোকর ওয়াজিব নয়, তাই কঙ্কর নিক্ষেপের পর মাথা হলক করে নিন; তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন (ওয়াজিব)।

৮. তাওয়াফে জিয়ারত করুন (ফরয)। যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করে থাকেন, তাহলে সাঈ করার প্রয়োজন নেই। (ওয়াজিব)।

১০. ১১-১২ জিলহজ আগে বর্ণিত নিয়ম ও সময়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

১১. বদলি হজকারী ইফরাদ হজ করবেন।

ইহরাম ও অন্যান্য পরামর্শ

ইহরাম সম্পর্কে জরুরি বিষয় :

যাঁরা সরাসরি বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরীফ যাবেন, তাঁরা বাড়িতে, হাজীক্যাম্পে বা বিমানে ইহরাম করে নেবেন। বাড়িতে বা হাজীক্যাম্পে ইহরাম করে নেওয়া সহজ। ইহরাম ছাড়া যেন মীকাত অতিক্রম না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

যাঁরা মদীনা শরীফ যাবেন, তাঁরা মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ যাওয়ার সময় ইহরাম করবেন। কোনো নারীর প্রাকৃতিক কারণে অপবিত্র অবস্থায় ইহরামের প্রয়োজন হলে ওজু-গোসল করে নামায ব্যতীত লাব্বাইক পড়ে ইহরাম করে নেবেন। তাওয়াফ ছাড়া হজ, উমরার সমস্ত কাজ নির্ধারিত নিয়মে আদায় করবেন।

তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

তাওয়াফের সময় ওজু থাকা জরুরি। তবে সাঈ করার সময় ওজু না থাকলেও সাঈ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সুন্নাত। তা আদায় করতে গিয়ে লোকজনকে ধাক্কাধাক্কির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বড় গোনাহ। তাই তাওয়াফকালে বেশি ভিড় দেখলে ইশারায় চুমু দেবেন।

সাঈ করার সময় সাফা থেকে মারওয়া কিংবা মারওয়া থেকে সাফা প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন চক্কর। এভাবে সাতটি চক্কর সম্পূর্ণ হলে একটি সাঈ পূর্ণ হবে।

মাসআলা : কোরবানীর দিন জামরায়ে উকবায় পাথর নিক্ষেপের পর তামাত্তু ও কেরান হজকারীর জন্য একটি বকরি বা এক উটের সাত ভাগের এক ভাগ দমে শোকর বা হজের কোরবানী দেওয়া আবশ্যক। যদি কোরবানী দিতে অক্ষম হন তবে কোরবানীর দিনের আগে তিন দিন এবং হজ পালন শেষ করে সাত দিন রোযা রাখবেন। এই রোযা চাইলে তাশরীকের দিনসমূহের পর মক্কাতেই রাখতে পারে অথবা বাড়ি ফেরার পরও রাখতে পারে। যদি কোরবানীর দিনের পূর্বে তিন দিন রোযা না রাখে তবে পরে রোযা রাখলে হবে না। বরং তাকে কোরবানীই দিতে হবে। (বাকারা ১৯৬, মুসান্নাফে ইবনে শাইবা ৫২২, ৫২৩)

মক্কায় দু'আ কবুল হওয়ার কয়েকটি স্থান

আল্লামা জাযরী (রহ.) হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর সূত্রে কিছু স্থান ও সময়ের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যেখানে যে সময় দু'আ কবুল হয়। তা নিম্নরূপ : ১। তাওয়াফের সময়। ২। মুলতাযিমের কাছে। ৩। মীযাবের নিচে। ৪। কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে। ৫। জমজম কূপের পাশে। ৬। সাফা পাহাড়ে। ৭। মারওয়া পাহাড়ে। ৮। সাঈর সময়। ৯। মকামে ইবরাহীমের পেছনে। ১০। আরাফার ময়দানে। ১১। মুযদালিফায়। ১২। মীনাতে। ১৩। জামরায়ে উলাতে।১৪। জামারায়ে উস্তাতে। (হাসান ৬৫)

মোল্লা আলী কারী (রহ.) এসবের সাথে আরো যুক্ত করে বলেছেন, রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি, দারে আরকাম, গারে সাওর এবং গারে হেরা ইত্যাদিও দু'আ কবুল হওয়ার স্থান। (নযলুল আবরার ৪৫)

সুতরাং হাজী সাহেবানদের উচিত, এসব স্থান ও সময়ে কায়মনোবাক্যে অশ্রুসজল নয়নে আল্লাহর কাছে মন খুলে দু'আ করা।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

কাফন-দাফনে বিলম্ব না করা :

মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম হলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাফন-দাফনের কাজ সম্পন্ন করা। তার মধ্যে বড় হিকমত হলো, এই সময়টা বড়ই পেরেশানির সময়। যত অপেক্ষা করা হবে, ততই পেরেশানি বাড়বে, খানাপিনার সময়ও পাওয়া যাবে না। ধরা যাক, কোনো লোক বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তেকাল করেছেন। আর তাঁকে যদি জুমু'আর পরে দাফন করা হয়; যেমন বর্তমানে প্রচলিত। এটি ঠিক নয়। বরং যদি পারা যায় জুমু'আর পূর্বেই দাফনের কাজ সম্পন্ন করা উচিত। তাতে বিলম্ব করা মাকরূহ।

وكره تاخير صلوٰته ودفنه ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلوٰة الجمعة۔

জুমু'আর দিন বাদ জুমু'আ জানাযা বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে দাফনে বিলম্ব করা মাকরূহ।

এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষার মাধ্যমে পেরেশানি দীর্ঘ হয়ে থাকে। বরং নতুন নতুন লোক যতই আসবে, ততই পেরেশানি তাজা হবে। তাই শরীয়তের নির্দেশ হলো যথাসম্ভব দাফনে বিলম্ব না করা। এর মধ্যে প্রত্যেকের সহজতা বিদ্যমান। যারা চলে যাবে তাদের জন্যও, মৃত ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন এবং মুহিব্বীনের জন্যও। তাই প্রত্যেকের এসব বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

প্রত্যেকের ওপর একদিন মাটি ঢালা হবে

প্রত্যেকের সময় নির্দিষ্ট আছে। কেউ জানে না তার মৃত্যুর সময় কখন। মোটকথা, প্রত্যেকের চলে যেতে হবে। কারো সিরিয়াল আগে, কারো সিরিয়াল পরে। যার ডাক আসবে তাকে চলেই যেতে হবে। তাই যাওয়ার ব্যাপারে ফিকির করো। হযরত খাজা সাহেব (রহ.) বলেন,

آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور
جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور
زندگی اک دن گذرنی ہے ضرور
قبر میں میت اترنی ہے ضرور
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے
روح رگ رگ سے نکالی جائے گی
تجھ پہ اک دن خاک ڈالی جائے گی
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

আখিরাতের ফিকির করা আবশ্যক। যেমন কাজ, তেমন ফল পাওয়া যাবে। একদিন জীবনের সংহার হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই একদিন কবরে যেতে হবে। একদিন মৃত্যু নিশ্চত, সর্বশেষ মৃত্যুই। যা করার করে নাও, সর্বশেষ মৃত্যু নিশ্চিত। ধমনীসমূহ থেকে রূহকে বের করা হবে। তোমার উপর একদিন মাটি ঢালা হবে। একদিন মৃত্যু বরণ করতে হবেই, সর্বশেষ মৃত্যু নিশ্চিত। যা করার করে নাও, সর্বশেষ মৃত্যু নিশ্চিত।

কিভাবে ইবাদতের হক আদায় হবে :

আমাদের কাছে যখন কোনো মেহমান আগত হয়, আমরা যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী তার মেহমানদারি ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে থাকি। তার সন্তুষ্টি, আরাম এবং শান্তির যাবতীয় আয়োজন করে থাকি। তার পরও উক্ত মেহমান চলে যাওয়ার সময় বলি আপনার পুরোপুরি মেহমানদারি আমরা করতে পারিনি। পুরোপুরি হক আদায় করতে পারিনি। বড় আশ্চর্যের বিষয় এখানেই, মেহমানের জন্য সব কিছু করার পর এ কথা বুঝে আসে যে তার মেহমানদারির হক আদায় করতে পারিনি, যতটুকু মেহমানদারি প্রয়োজন ছিল আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা মনে করে বসি যে আমার নামায, রোযা, তিলাওয়াত এবং অন্যান্য ইবাদত সব পুরোপুরি হয়ে গেছে! এখানেও তো কমতি হয়ে যায়। তাই আল্লাহওয়ালাগণ বলেন, যদি কোনো ইবাদতের তাওফিক হয় তবে এই দু'আ করা, আল্লাহ! এই ইবাদতের যে হক আছে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়নি। যথাসম্ভব করেছি। আপনার ফজল ও করমে আমার এই ইবাদত কবুল করুন।

কাজই উদ্দেশ্য হালত উদ্দেশ্য নয় :

দুটি বিষয় আছে। একটা হলো কাজ। আরেকটা হলো হালত-অবস্থা। সর্বক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে কাজ। হালত এবং অবস্থা উদ্দেশ্য নয়। যেমন গরমের মৌসুম। পাখা চলছে, কোলার চালু রয়েছে, এয়ার কন্ডিশন চলছে। তাতে একজন বসে কাজ করছে। আরেকটা হালত হলো, পাখাও নেই, কোলারও নেই। এয়ার কন্ডিশন তো দূরের কথা। প্রখর রোদে কাজ করছে। রাতে মশা হানা দিচ্ছে। এমন নাজুক অবস্থাতেও কাজ করছে। এগুলো হলো হালত। কিন্তু সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য হলো কাজ। বিলাসবহুলতার মধ্যে কাজ করা বিশেষ যোগ্যতা নয়। বরং খুব কষ্টের মধ্যে কাজ করতে পারা এবং এরূপ কষ্টের মধ্যে কাজে মন বসানোকেই যোগ্যতা মনে করা দরকার। এটিকেই মূল আহারীয় মনে করা প্রয়োজন। যদি কষ্টের মধ্যে কাজ করাকে কষ্ট মনে হয় এবং অন্তরে খুব ভারী মনে হয় তখন উক্ত কাজকে ওষুধ মনে করা দরকার। কিছু কিছু ওষুধ খুবই তিতা হয়। কিন্তু চিকিৎসার খাতিরে তা ব্যবহার করতে হয়। তেমনি কাজই উদ্দেশ্য। প্রত্যেক অবস্থাতেই কাজে লেগে থাকা। তখন ইনশাআল্লাহ রাস্তা খুলে যাবে। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসবে।

একদা হযরত সালমান নদভী (রহ.) হযরত থানভী (রহ.)-এর প্রতি লিখলেন, কোনো কোনো সময় কাজে মনে বসে না। খুব ভারী মনে হয়। কাজ করতে ইচ্ছা হয় না। হযরত তাঁর জবাবে লেখেন, মনে করবেন, এটির সংশোধন ও তারবিয়্যাত হচ্ছে।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

শিক্ষাকালে তালেবে ইলমের করণীয়

পবিত্র শাওয়াল মাস থেকে দ্বীনি মাদরাসাগুলোর শিক্ষা বছরের সূচনা হয়। দীর্ঘ ছুটিতে বিরান পড়ে থাকা মাদরাসাগুলো ফিরে পায় পুনরায় তার আসল সৌন্দর্য। অযাচিত অনাকাঙ্ক্ষিত শূন্যতা দূর হয়ে ফিরে আসে কোলাহল। ইলমে দ্বীনের পিপাসু তালেবে ইলমরা ইলমের তাড়নায় শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে, কত প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে, পরম স্নেহশীল মা-বাবা এবং আত্মীয়-স্বজনকে আল-বেদা বলে, ঘরে থাকা যাবতীয় সুখ-শান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে, অজানা-অচেনা পরিবেশে মাদরাসাকে আপন ঘর হিসেবে গ্রহণ করে, আসাতেযায়ে কেরামকে পিতৃতুল্য এবং সঙ্গী-সাথীদের ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে বছরের পর বছর–মৃত্যু পর্যন্তের জন্য এ পথের একজন স্বার্থক মুসাফির হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে। আত্মোৎস্বর্গের বিবেচনার মুসলিম উম্মাহের এই স্তরটিকে দেখা হলে অবশ্যই তাদের উৎসর্গ নজিরবিহীন। তবে তাদের কোরবানীকেও অস্বীকার করা যাবে না, যাদের ছেড়ে তারা মাদরাসায় পাড়ি জমিয়েছে।

এত সব ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, সত্যিকারের ওয়ারিছুন্নবী (সা.) বনা। সিফাতে নববিয়্যাহ ও আখলাকে নববীয়াহর ধারক-বাহক বনা। উম্মতের পথপ্রদর্শক বনা। দ্বীন ও সুন্নাতে নববিয়্যাহর প্রচার-প্রসার করা। রসম বিদ'আতের মূলোৎপাটন করা। সর্বস্ব দিয়ে বাতিলের মোকাবেলা করা এবং এর জন্য নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনে পর্দার গুরুত্ব তুলে ধরা ও বাস্তবায়নে আপ্রাণ চেষ্টা করা। বেহায়াপনা-নির্লজ্জতার মন্দ দিকগুলো তুলে ধরা ও হারিয়ে যাওয়া লজ্জা-শরমের অনুভূতির পুনর্জাগরণে সচেষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

এখন একজন ছাত্র যদি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে অন্ধের ন্যায় ছাত্রজীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করতে থাকে তবে কি তা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই তা তার নিজের ওপর, পরিবারের ওপর ও সমাজের ওপর জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে। হয়তো বা নিজে ভ্রষ্ট হয়ে অন্যের পথভ্রষ্টের কারণও হতে পারে। নাউজু বিল্লাহ।

এসব বিষয়কে সামনে রেখে ভালো মনে করলাম যে আজিজ তালাবাদের শিক্ষাকালে করণীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। হয়তো তা কোনো তালেবে ইলমের অন্তরে গেঁথে যাবে এবং আলোকিত জীবনের পাথেয় হবে।

নিয়্যাত সহীহ করা :

ইলম উপকারী হওয়ার সম্পর্ক নিয়্যাত সহীহ হওয়া না হওয়ার সাথে। আল্লাহ না করুন, ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্য যদি দুনিয়ার মোহ হয় তাহলে এই নিয়্যাত একজন তালেবে ইলমকে দুনিয়াতেই দুনিয়াদারদের সামনে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। আর আখিরাতে সবার আগে জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। এই ইলম হবে তার জন্য অভিশাপের কারণ। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে–

ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه ... رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فاتى به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارى، فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى فى النار

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ওই ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা করা হবে... যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) ইলম শিখেছে ও শিখিয়েছে এবং যে ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে ইলমের নিয়ামতের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ বলবেন, এই নিয়ামত অনুযায়ী কী আমল করেছো? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি, শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কোরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো ইলম শিখেছ মানুষ তোমাকে আলেম বলার জন্য। আর কোরআন তিলাওয়াত করেছ তোমাকে তিলাওয়াতকারী বলার জন্য। দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম করা হবে। এবং তাকে উপুর করে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء

ولاتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار فالنار

"আলেম সমাজের ওপর বড়ত্ব দেখানো, অবুঝ জনসাধারণের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ানো এবং মজলিস জমানোর নিয়্যাতে ইলম অর্জন করো না, যে ব্যক্তি এ রকম করবে জাহান্নামই তার ঠিকানা। (ইবনে মাজাহ)

নিয়্যাত তো এটা হতে হবে যে, এই ইলম দ্বারা পুরো দুনিয়ায় দ্বীনে ইসলামকে যিন্দা করব, এ ধরনের নিয়্যাতকারীর যদি এই অবস্থাতেই মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা ওই তালেবে ইলমের হাশর এভাবে করাবেন যে, তার মাঝে এবং নবীগণের মাঝে শুধুমাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে। যেমন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

من جاء ه الموت وهو يطلب العلم ليحى به الاسلام فبينه وبين الانبياء فى الجنة درجة واحدة۔

"ইসলামকে যিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণকারীর মৃত্যু হলে জান্নাতে তার মাঝে এবং নবীগণের মাঝে শুধুমাত্র একটি স্তরের (নবুওয়াত) পার্থক্য থাকবে।" (জামিউ বায়ানিল ইলম)

অতএব সর্বপ্রথম কাজ হলো, নিজের নিয়্যাতকে ঠিক করা আর এ কাজটি বারবার করতে হবে। যখনই অনুভব করবে যে নিয়্যাত বিকৃত হয়ে গেছে তখনই তা ঠিক করে নিতে হবে।

আরেকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, তালবে ইলমের যমানায় যদি নিয়্যাত ঠিক না হয় তাহলে ইলম অন্বেষণ বন্ধ করা যাবে না। বরং নিয়্যাত দুরস্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। নিয়্যাত দুরস্ত হয় না–শুধু এই বাহানায় তলবে ইলম থেকে বিরত থাকা কোনো অবস্থাতেই সমীচীন হবে না। কারণ বুযুর্গদের উক্তি প্রসিদ্ধ–

تعلمنا العلم لغير الله فابى العلم الا ان يكون له۔

"আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছিলাম, কিন্তু ইলম আমাদের মনোবাসনা মেনে নেয়নি। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর জন্য হয়েই ক্ষান্ত হয়েছে।" অতএব ইলম অন্বেষণ তরক না করে নিয়্যাত দুরস্ত করার প্রতি আত্মনিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যোগ্যতার দৃঢ় করণ :

নিয়্যাত সহীশুদ্ধ করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ইলমী যোগ্যতাকে সুদৃঢ় করা। এর জন্য প্রথম দিন থেকেই কোমর বেঁধে নেমে যেতে হবে। মাদরাসাগুলোতে যত ধরনের ইলমের পড়াশোনা হয় সেসব বিষয়ে নিজেকে এ পরিমাণ যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে যেন কারো সামনে কোনো ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত না হয়। এবং তোমাদের সামনে যে কেউ যেকোনো বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে যেন ছাড় পেয়ে না যায়। এমন যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ও দিকনির্দেশনা যারপরনাই ফলপ্রসূ। হযরত বলেন, যে তালেবে ইলম তিনটি কাজ করবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে ইলমের দৌলত দান করবেন। ১. মুতালা'আ-অধ্যয়ন করা। ২. মনোযোগ সহকারে নিয়মিত দরসে উপস্থিত থাকা। ৩. তাকরার করা। এই তিনটি কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া সফলতার চাবিস্বরূপ। সংক্ষিপ্তাকারে এই তিনটি জিনিসের পরিচয় তুলে ধরা হলো–

মুতালা'আ :

জানা বিষয়কে অজানা বিষয় থেকে পৃথক করার নাম মুতালা'আ। অর্থাৎ যখন তুমি সবকে অংশগ্রহণের পূর্বে আগামী দিনের সবক মুতালা'আ-অধ্যয়ন করবে এবং সবকটিকে নাহবী, ছরফী ও ভাষাগতভাবে বিশ্লেষণ করবে, তরজমা, তারকীব এবং ভাব বোঝার চেষ্টা করবে এবং এই প্রচেষ্টায় যে সফলতা তোমার অর্জন হবে, সেটাকে 'মা'লুমাত' বলা হবে। আর যা বুঝে আসবে না তাকে 'মাজহুলাত' বা অজানা বিষয় বলা হবে। মাজহুলাতকে স্মরণ রাখা অতীব জরুরি। যেন অন্য সময় কোনো সাথী ভাই থেকে অথবা সবকে উস্তাদের মাধ্যমে বিষয়টির সহজ সমাধান হয়ে যায়। মুতালা'আর এতটুকু চেষ্টা সাধনা তোমাকে অনেক অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ...

দরসে উপস্থিতি :

মুতালা'আর পরই আসে সবকে নিয়মিত উপস্থিত থাকার বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, যেন তোমার থেকে কোনো সবক ছুটে না যায়। এবং অমনোযোগী ও গাফেল হয়ে সবকে বসা না হয়। এই চেষ্টায় সফলতার জন্য আবশ্যকীয় হলো, সবক চলাকালীন উস্তাদের মুখ থেকে যে কথাই নিসৃত হবে তা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং অন্যদিকে কান না দেওয়া। এ রকমভাবে তোমার চোখ উস্তাদের দিকেই নিবিষ্ট থাকতে হবে, চুরি করে এদিক-সেদিক তাকানো যাবে না। আর মন-মস্তিষ্ক থাকতে হবে পরিপূর্ণভাবে সবকমুখী। সবকে আলোচিত বিষয়গুলোকে যেহেনে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতে হবে। পড়ানো শেষ হলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে খাতায় নোট করে নেওয়ার প্রতি হতে হবে যত্নশীল।

তাকরার :

সর্বশেষে তাকরারের স্তর। সবকে আলোচিত ও পড়ানো বিষয়কে অন্যের সাথে আলোচনা করার নাম তাকরার। এই স্তরে এসে মুতালা'আ এবং সবকে থেকে যাওয়া ত্রুটি বিদূরিত হয়। অসম্পূর্ণতার মধ্যে আসে পূর্ণতা। তাকরার যত কার্যকর পদ্ধতিতে করা হবে কিতাবের জ্ঞান ততই বেশি মজবুত

ও দৃঢ় হবে। বুযুর্গদের উক্তি প্রসিদ্ধ যে, একজন তালবে ইলম তাকরারের বেলায় যত অভিজ্ঞ হবে, সে তত উত্তম মুদাররিস হবে। তাকরারের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা হলো তাকরারকারীর যতটুকু উপকার হয় শ্রবণকারীর ততটুকু উপকার হয় না। এ জন্য উত্তম হলো, তাকরার দুজনে করা। একজন বলবে অপরজন শুনবে, এরপর দ্বিতীয়জন বলবে প্রথমজন শুনবে। তাকরারের সঙ্গী বেশি হলে শুধুমাত্র একজনই আলোচক হয় অন্যরা শ্রবণকারী ফলে তারা বেশি উপকৃত হতে পারে না।

সুন্দর লেখনী :

হস্তলিপি সুন্দর হলে একজন আলেমে দ্বীন খুব ভালোভাবে দ্বীনি খিদমত করতে পারেন। আর পরবর্তী প্রজন্মের ওপর এর প্রভাবও অত্যন্ত সুখকর হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি অর্জনের জন্য প্রত্যেক তালবে ইলমকে প্রথম দিন থেকেই মেহনত শুরু করে দিতে হবে। সম্ভব হলে কোনো অভিজ্ঞ কাতেবের শরণাপন্ন হয়ে নিয়মিত মশক করে যেতে হবে। সর্বপ্রথম হুরুফে তাহাজ্জীর গঠন আকৃতিকে নিয়মানুযায়ী যেহেনে সংরক্ষণ করে নিতে হবে। এরপর মুরাককাবাত তথা যৌগিক শব্দের মশক করতে হবে। উল্লেখ্য, যেকোনো হরফের ব্যবহারের তিনটি সুরত নিশ্চিত। হরফটি শব্দের শুরুতে হবে মাঝে হবে বা শেষে হবে। এই তিনটি অবস্থায় হরফের গঠনাকৃতি কী হবে, এটা শিখে মশক করবে। হস্তলিপি সুন্দর করার আরেকটি সহজ পদ্ধতি হলো, যখনই কোনো কাতেবের লেখা কোনো শব্দ দেখবে তখন শব্দের লেখার ধরনটিকে ভালো করে পরখ করবে এবং পরে হুবহু লেখার চেষ্টা করবে। এভাবে অতি সহজে খুব দ্রুত হস্তলিপি সুন্দর হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ...

নেসাবের বাইরে মুতালা'আ :

দরসে নেজামীর তা'লীমের সাথে সাথে দ্বীনিয়্যাতের মুতালা'আর পরিধি বাড়ানো অতীব জরুরি। দ্বীনি মুতালা'আর পাশাপাশি নিত্যনতুন বিষয়ে সম্যক অবগত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিতাবাদি পড়তে হবে। যাতে করে আস্থার সাথে বিষয়টির শরয়ী সমাধান পেশ করা যায় এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণ যেন তোমাদের অজ্ঞ মনে না করে। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয় হলো, এর দ্বারা নেসাবে তা'লীম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবে না। উল্লেখ্য, ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিতাব, বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যেমন–নোবেল, উপন্যাস, রাজনৈতিক বিষয়ে রচিত বই, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি। এ জন্য ঝুঁকিমুক্ত উত্তম পন্থা হলো অভিজ্ঞ উস্তাদদের সাথে পরামর্শ করে পা বাড়ানো। যাঁরা গুরুত্ব বুঝে কোনো বিষয় ও কিতাব ঠিক করে দেবেন। আর এ ধরনের অধ্যয়ন অবসর সময়ে সুযোগ হলে করতে হবে। তা'লীমী আওকাতে নয়।

তাজবীদ ও হিফযুল কোরআন :

যেসব ছাত্ররা হাফেজে কোরআন নয় সাধারণত তারা দু-তিন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমত, হাফেজ না হওয়ার কারণে কিছু ক্ষেত্রে তারা কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ে। যেমন–নামায পড়ানোর সময় বিশেষ করে ফজরের নামায পড়ানোর জন্য বললে। অনেকে আবার কাওয়ায়েদে তাজবীদের ব্যাপারে আনকোরা হয়ে থাকে। এ রকমভাবে বয়ান ও তাকরীরে কোরআনের আয়াত জুতসইভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। তাই তোমাদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ হলো, শুরু থেকেই তোমরা এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে ফিকির মন্দ হও। দৈনন্দিন অল্প অল্প করে মুখস্থ করতে থাকো। বিশেষ করে সর্বশেষ তিনটি পারা এবং বিশেষ বিশেষ ফজীলতপূর্ণ সূরাগুলো মুখস্থ করে নাও। যেমন সূরা ইয়াসিন, সূরা ওয়াকিয়াহ, সূরা আর রহমান ইত্যাদি। আর যারা তাজবীদের ব্যাপারে দুর্বল তারা অভিজ্ঞ কোনো কারীর শরণাপন্ন হয়ে ইলমে তাজবীদ শিখে মশক করে নাও। জুমু'আ দুই ঈদ এবং নিকাহসংক্রান্ত খুতবাও তটস্থ করে নাও। ইনশাআল্লাহ কোথাও কখনো কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে না।

অছাত্রসুলভ কর্মব্যস্ততা :

এ বিষয়টি সব সময় সামনে রাখতে হবে যে তোমরা মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, ঘরবাড়ি–সব কিছুই ছেড়ে মাদরাসায় এসেছো। উদ্দেশ্য ইলমে দ্বীন অর্জন করা। অতএব তোমাদের জন্য এমন সব ব্যস্ততা প্রোগ্রাম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা জরুরি, যা তোমাদের তা'লীমী ক্ষতির কারণ হয়। সবার আগে ক্ষতিকর যে জিনিসটির নাম উচ্চারিত হবে সেটা হলো, কোনো রাজনৈতিক দল বা যেকোনো ধরনের সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। এই সম্পৃক্ততা একজন তালবে ইলমের জন্য যহরে কাতেল। তা'লীমী যমানার প্রতিটি মুহূর্ত তোমাদের জন্য মহা মূল্যবান। এ সময় একাগ্রচিত্তে তা'লীমের সাথেই তোমাদের লেগে থাকতে হবে, জুড়ে থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, ফারেগ হওয়ার পর কোনো দল বা সংগঠন যদি শরীয়তের কষ্টিপাথরে উতরে যায় তাহলে সেই দল বা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারো–এটা তোমার ঐচ্ছিক ব্যাপার। অথবা সময়ের দাবি যদি কখনো কোনো ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো হয় তবে সে ডাকেও সাড়া দিতে পারবে। মনে রাখবে, সাড়া দেওয়ার সময় এখন নয়। যখন আসবে তখন। সময়ের আগেই কোনো জিনিস পেতে চাইলে, করতে চাইলে বঞ্চনাই তোমার কপালে জুটবে। এখন তা'লীমের সময় তা'লীমের সাথে

লেগে থাকো। দেখবে সফলতা তোমার পদচুম্বন করবে।

মোবাইল ফোন :

মোবাইল ফোন ছোট একটি আবিষ্কার। যার মধ্যে উপকারী-অপকারী দুটি দিকই রয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের জন্য উপকারী হওয়ার দিকটি প্রাধান্য পেলেও কোনো কোনো ব্যক্তির বেলায় অপকারী হওয়ার দিকটি প্রবল। আবার কারো কারো বেলায় এটা সম্পূর্ণভাবে প্রাণঘাতী। দেখো, এই যন্ত্রটি যাদের আবিষ্কার তারা এর ক্ষতিকর দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এর অনুপ্রবেশকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে যাচেছ। নামিদামি স্কুল-কলেজ, ভার্সিটিগুলোতে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং অমার্জনীয় অপরাধ। আবিষ্কারক হয়েও এর ব্যবহার নিষিদ্ধ ও অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করার পরও কি তোমাদের বোধোদয় ঘটবে না। এর পরও কি তোমাদের চক্ষুদ্বয় খুলবে না। অথচ এই যন্ত্রটি তোমাদের ঈমান-আমল ধ্বংসকারী, চরিত্র বিনষ্টকারী, সুস্থতা হরণকারী, অহেতুক ও গোনাহের কাজের প্রতি প্ররোচনা দানকারী, অর্থ ও সময় দুটিকেই মারাত্মকভাবে নিঃশেষকারী, লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। গুরুত্ব সহকারে শোনো, এখানে (মারকাযে) মোবাইল ফোন ব্যবহার, রাখা, সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও অমার্জনীয় অপরাধ। এর পরও যদি কেউ মোবাইল রাখে ও ব্যবহার করে বা কোনো রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে আমরা মনে করব সে আমাদের সাথে থাকতে অনিচ্ছুক। বলো তো থাকতে অনিচ্ছুক একজন লোককে আমরা কিভাবে রাখব?

আসাতেযায়ে কেরাম ও ছাত্র ভাইদের হক :

একজন ভালো ও যোগ্য তালেবে ইলমের মকাম হাসিল করতে হলে তোমার অন্তরে আসাতেযায়ে কেরামের প্রতি অগাধ মহব্বত থাকতে হবে। তাঁদের প্রতি যারপরনাই একরাম-এহতেরাম প্রদর্শন করতে হবে। তাঁদের বৈধ আদেশ শুনতে হবে মানতে হবে। তাঁদের উপদেশবাণীকে সফলতার চাবি মনে করতে হবে। বলার অপেক্ষা না করে খিদমতের উপযুক্ত কাজ খুঁজে খুঁজে করতে হবে। যে তালেবে ইলম এসব কাজ আন্তরিকভাবে করবে তার উন্নতি দ্রুত, অতি দ্রুত সাধিত হবে। মনে রাখবে, যারা এসব কাজ বদনিয়্যাতে, বাধ্য হয়ে বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে করবে তারা সফলতা নয়, ধ্বংস ও বরবাদীর অপেক্ষা করতে পারে!

তা'লীমী যমানায় আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। সেটা হলো, সাথীদের সাথে আচার-ব্যবহার। দেখো! একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাকে ইজতেমায়ী পরিবেশে থাকতে হবে। এই পরিবেশে কিছু সময় তোমার দরসেগাহের সাথীদের সাথে ব্যয় করতে হবে। কিছু সময় কামরার সাথীদের সাথে থাকতে হবে। আর কিছু সময় দিতে হবে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ছাত্রের সাথে। এই তিনটি স্তরের প্রতিটির বেলায়ই যদি নিজের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যে, আমি আমার সব ধরনের সাথীর সর্বপ্রকার হক আদায়ে সচেষ্ট থাকব। আমার দ্বারা কাউকে কোনো ধরনের কষ্ট পেতে দেব না। অনুমতি ছাড়া কারো কোনো জিনিস ব্যবহার করব না। তবে দেখবে আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র গুণের কারণে সকল সাথীর অন্তরে তোমার একরাম-এহতেরাম, ইজ্জত, মহব্বত ঢেলে দেবেন। এভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে না পারলে তুমি আশান্তিতে ভুগবে। সবাই তোমার থেকে দূরত্ব বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। যে রকমভাবে হিংস্র জন্তু এবং কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে। তোমার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সাথীরা তোমার সাথে সালাম-কালাম করবে না। করলেও আন্তরিকভাবে ঘৃণা করবে এবং বদ-দু'আ করবে। বলো তো এর চেয়ে বড় হতভাগা আর কে হতে পারে?

নিজেকে একজন ভালো ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করার জন্য বলিষ্ঠভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যে, যখন যার সাথেই মিশতে হবে এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিশবে, যেন পরবর্তীতে সে তোমার দিদার ও সাক্ষাৎ আন্তরিকভাবে কামনা করে। কিছু সময় তোমার সাথে বসা ও সময় কাটানোকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করে। তবেই তুমি সবার প্রিয় পাত্রে পরিণত হতে পারবে।

মাদরাসার নিয়ম-কানুন :

ইলমের তরক্কীর জন্য কিছু কাজ জরুরি। এর মধ্যে হতে একটি হলো, প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন মেনে চলা। অনস্বীকার্য বিষয় হলো, কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন ছাড়া চলতে পারে না। এসব কিছুই করা হয় নেজামকে দুরস্ত রাখার খাতিরে। আর প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুন মেনে চললে ইলম অর্জনের পথ মসৃণ-কণ্টকমুক্ত হবে। ইলমী তরক্কী পদ চুম্বন করতে সময় নেবে না। জীবন হবে ধন্য, সুখী ও পরিমার্জিত। সবাই তোমার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। যেমন–তুমি নিয়ম করে নাও, দরসের সময় হওয়ার সাথে সাথে দরসেগাহে উপস্থিত হবে। খাওয়াদাওয়ার সময় হলে খেতে চলে যাবে। ঘুমের সময় হলে ঘুমিয়ে যাবে। আর যখন দরসেগাহ, থাকার কামরা ও প্রতিষ্ঠানিক পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা বা যেকোনো খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার পালা আসে তখন তা নিষ্ঠার সাথে পালন করো। দেখবে মাদরাসার কোনো

উস্তাদ-ছাত্র তোমার দ্বারা কষ্ট পাবে না। তোমার ব্যাপারে তাদের কোনো অভিযোগও থাকবে না। নিজেও কারো কাছ থেকে অযাচিত ব্যবহারের মুখোমুখি হবে না।

এসলাহে নফস :

অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা হলো, বছরের পর বছর এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনত করে যাওয়ার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একটাই, আল্লাহর যাবতীয় হুকুম-আহকাম মেনে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের ইত্তেবার মাধ্যমে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা এবং সিদ্দিকীন ও সালেহীনদের কাতারে নিজেকে শামিল করা। সবাইকে এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো কাজ সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর খেলাফ না হয়, সুন্নাত মোতাবেক জীবন গঠনের চেষ্টা করা জীবনের সব ধরনের চেষ্টা প্রচেষ্টা থেকে মহা মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা রাসূল (সা.)-এর ওয়ারিশ মানে ইলম, আমল ও আখলাকের ওয়ারিশ। অন্য কিছুর না। অতএব তোমাদের মাঝে যদি সুন্নাতের ইত্তেবা ও আখলাকে নববীর লেশ মাত্র দেখা না যায় তবে বলো তো নিজেকে কিভাবে নবীর ওয়ারিশ বলে দাবি করবে! এ ধরনের দাবি কি মিথ্যা ও ভণ্ডামীর অন্তর্ভুক্ত হবে না? মাদরাসায় পড়ার আগে পরের জীবনের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য গড়ে তুলতে না পারো তাহলে মাদরাসায় পড়ার স্বার্থকতা রইল কী? অতএব তোমাকে ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক চরিত্র ও খিদমতে খলকের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যেন মানুষ নিজের সন্তানদেরকে তরবিয়ত প্রদানকালে তোমাকে উদাহরণ-উপমা হিসেবে পেশ করে। তোমাকে দেখে সবাই যেন এই তামান্না করে যে, আহ! আমার সন্তানও যদি এ রকম হতো! বাস্তবে যদি তোমরা প্রত্যেকে এ রকম হতে পারো তবে তোমরা মেছালী তালেবে ইলম হতে পারবে। মানুষ নিজেদের মাথায় তোমাদের স্থান দেবে। তোমাদের ইজ্জত এহতেরাম করবে, তোমাদেরকে মহব্বতের নজরে দেখবে, মনোযোগ সহকারে তোমাদের কথা শুনবে, যেকোনো ব্যাপারে তোমাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে, তোমাদের সান্নিধ্যে থাকার চেষ্টা করবে, তোমাদের কোনো খিদমত করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে, সন্তানদের তরবিয়ত দানকালে তোমাদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করবে এবং নিজেদের সন্তাদেরকেও মাদরাসায় পড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ হবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা তোমার পদচুম্বন করবে। মনে রাখবে, এসলাহ নিজে নিজে করা যায় না এর জন্য কোনো মুসলেহ মুরব্বির শরণাপন্ন হতে হবে। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন.....

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

খ্রিস্টধর্ম : কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-১

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

ইসলাম কোনো ঐশী ধর্মকে অস্বীকার করে না। বরং ইসলামের কথা হলো ইহুদী ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্ম। বড় বড় নবী-রাসূলের মাধ্যমে এসব ধর্ম প্রেরিত হয়েছে। তাঁদের জন্য কিতাবও দেওয়া হয়েছে। ইসলাম পূর্ববর্তী যাবতীয় আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল (আ.) এবং আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মসমূহের ওপর ঈমান রাখা ইসলামী আকীদার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি ইসলামে পালনাবশ্যক অনুশাসনগুলোর মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলো পূববর্তী নবী-রাসূলদের আমলে তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসন হিসেবেই প্রচলিত ছিল।

ইসলাম হলো আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্মের মধ্যে সর্বশেষ সংস্করণ। এর পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোনো ধর্ম আসবে না। বিগত ধর্মগুলো যেভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন পরবর্তীতে তা হুবহু সংরক্ষিত থাকেনি। আবার সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম আগমনের পর বাকি ধর্মগুলো রহিত হয়ে গেছে। এসব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই বলে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন-হাদীসে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বিগত ঐশী ধর্মগুলো যে অবিকৃত থাকেনি তার বিভিন্ন প্রমাণ বর্তমানে প্রচলিত ওই সব ধর্মগ্রন্থ থেকেই পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে একটি বৃহৎ ধর্ম হলো খ্রিস্টধর্ম, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণ-অকারণে উক্ত ধর্ম হুবহু সংরক্ষিত থাকেনি। এই ব্যাপারে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে প্রমাণসহ বিশদ আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক্ব (দা বা.)। প্রবন্ধটি সম্প্রতি বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। মাসিক আল-আবরারের পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা প্রবন্ধটি ধারাবাহিক প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা আল্লামাকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন। (আল-আবরার পরিবার)

ভূমিকা :

الحمد لله رب العلمين والصلاة على النبى الكريم

'খ্রিস্টধর্ম : কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা' শীর্ষক বইটি খ্রিস্টধর্মের ওপর একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা গ্রন্থ। এতে একজন পাঠককে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিস্টধর্মের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার আহবান জানানো হয়েছে। সংগত কারণেই এতে আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষমূলক আচরণ কিংবা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো উচ্চারণ সতর্কতার সাথে পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা, অতিরঞ্জন ও অসতর্কতা এড়িয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথ গ্রহণের নিবেদন করা হয়েছে।

এ 'পর্যালোচনা গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণাকালে খ্রিস্টধর্মের মৌলিক ছয়টি বিষয়ে বাইবেলের বিপরীতমুখী বক্তব্যে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আমাদের এ গ্রন্থে সে বিষয়সমূহের পর্যালোচনার প্রতিই সম্মানিত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ–

১. খ্রিস্টধর্মে অনুসরণীয় কে? যিশুখ্রিস্ট, নাকি সেন্ট পল?

২. 'বাইবেল' আল্লাহর নাযিলকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল, নাকি সেন্ট পলের ধর্মগ্রন্থ?

৩. খ্রিস্টধর্মে স্রষ্টা একজন, নাকি তিনজন?

৪. খ্রিস্টধর্মে ঈসা আলাইহিস সালামের অন্তর্ধান : ক্রুশে হত্যা করা হয়েছে, নাকি সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?

৫. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুয়ত সর্বজনীন, নাকি কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য?

৬. শেষ নবী কে? হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, নাকি হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?)

খ্রিস্টধর্মের মৌলিক এ ছয়টি বিষয় নিয়েই আমরা আমাদের পর্যালোচনা সংক্ষেপণ করলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নিমিত্তে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণের আলোকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, সত্যসন্ধানী পাঠক খ্রিস্টধর্মের ওপর আমাদের এ দালিলিক ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা মূল্যায়ন করবেন এবং এ পর্যালোচনার আবেদন ও নিবেদনের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করবেন।

উদ্ধৃতি প্রসঙ্গ

১. বিষয়বস্তুর প্রমাণে আমরা বাংলা বাইবেলের পাশাপাশি আগ্রহী পাঠকদের জন্য ইংরেজি বাইবেলের উদ্ধৃতিও তুলে দিয়েছি। যেন খ্রিস্টধর্মের আলোচনা খ্রিস্টধর্মীয় সমাজে স্বীকৃত 'মৌলিক উৎসগ্রন্থের উদ্ধৃতি-সমৃদ্ধ হয়।

২. ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সময়ে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় বাইবেলের বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। এটিই অন্যান্য ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দাসের মূল ভিত্তি। ইংরেজি এ অনুবাদটি কিং জেমস ভার্সন (King James Version), সংক্ষেপে (KJV) নামে পরিচিত। ইংরেজি বাইবেলের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত (KJV)-এর নতুন সংস্করণ (NKJV)-এর হুবহু অনুসরণ করেছি। কেননা, বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ ও সংস্করণ থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টসমাজের সর্ববৃহৎ শ্রেণির মাঝে 'কিং জেমস ভার্সন'ই সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং ইংরেজি বাইবেল সংস্করণগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম।[১]

তবে হ্যাঁ, ক্ষেত্রবিশেষে রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্সন (RSV) থেকেও আমরা উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছি। এ জাতীয় ক্ষেত্রে টীকায় তা লিখে দেওয়া হয়েছে।

৩. বাইবেল ও অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলো যত্নের সাথে সম্পাদনা করে দিয়েছেন ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ আমেরিকা নিবাসী Dr. Mufti Rezwanul Hasan, MBBS। যিনি বর্তমানে Darul Uloom New Jersey, Paterson, NJ, USA-তে শিক্ষকতা করছেন।

৪. বাইবেলের বাংলা উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা 'বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি' কর্তৃক ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত জন কেরির 'পবিত্র বাইবেল' থেকে হুবহু তুলে দিয়েছি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে যেখানে জন কেরির অনুবাদ প্রাচীনতার দরুণ দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, সেখানে 'কিতাবুল মোকাদ্দাস' থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে টীকায় তা লিখে দেওয়া হয়েছে।

৫. বাইবেলের পরিচিতি বিস্তারিতভাবে মূল গ্রন্থের আলোচনায় সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বাইবেলের বাংলা ও ইংরেজি উদ্ধৃতি অনুধাবনের সুবিধার্থে গ্রন্থের শেষে পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল পুস্তকের একটি 'নির্ঘণ্ট' সংযুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থ পাঠের আগে সম্মানিত পাঠক এ নির্ঘণ্ট পড়ে নিলে উদ্ধৃতির 'অপরিচিত'র ভাব দূর হবে আশা করা যায়।

৬. বাইবেলের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা প্রথমত সংশ্লিষ্ট পুস্তকের নাম, অতঃপর অধ্যায় নম্বর, এরপর পদ নম্বর উল্লেখ করেছি। যেমন (মথি ১৫:২৪)-এর অর্থ হলো, মথি নামক পুস্তকের ১৫তম অধ্যায়ের ২৪ নং পদ।

৭. বাইবেলের উদ্ধৃতি পাঠের ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে পর্যালোচনায় খ্রিস্টধর্মের আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে বাইবেলের উদ্ধৃতি কেবল এ জন্যই দেওয়া হয়েছে যে খ্রিস্টধর্মে এ গ্রন্থ ধর্মীয় বিষয়ে 'দলিল-প্রমাণ' হিসেবে বিবেচিত।

৮. পরিভাষাগত আলোচনায় আমরা সাধারণত বাইবেল ও খ্রিস্টধর্মের পরিভাষাই ব্যবহার করেছি। যেমন, ঈশ্বর = আল্লাহ, ভাববাদী = নবী, ভাববাণী = নবীর বাণী, মোশি = মূসা (আ.), যিশু = ঈসা (আ.), ইশ্মায়েল = ইসমাঈল ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে বন্ধনীতে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও করে দেওয়া হয়েছে।

৯. পর্যালোচনাকে প্রামাণ্য করতে গিয়ে অনেক খ্রিস্টান পণ্ডিত ও গবেষকদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করতে হয়েছে। ইংরেজি লেখক ও গবেষকগণের নাম বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে কোনো বাংলা ভাষাভাষীর রচনার ওপর নির্ভর না করে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট ভাষার Pronunciation বা 'উচ্চারণনীতি' অনুসারে বাংলায় তা লিখে দিতে। ব্যক্তি সুনির্দিষ্টকরণের স্বার্থে ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুসনও বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. বার্নাবাসের বাইবেল প্রসঙ্গ

এ কিতাবে দু-এক জায়গায় বার্নাবাসের বাইবেল থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের অনুসারীগণ বার্নাবাসের বাইবেলকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবী প্রকৃত বার্নাবাসের লিখিত মনে করেন না। তাঁদের মতে, এ সুসমাচারটি কোনো মুসলমানের রচনা। এ ধারণার মৌলিক কারণ হলো, (১) নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে এ গ্রন্থ বার্নাবাস হতে আমাদের নিকটে পৌঁছেনি। (২) এ বাইবেলে সেন্ট পলের বিরুদ্ধে জোরালো আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ বাইবেলের বিপরীতে ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্ম ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা ৩/২৬২) নিবন্ধ : বার্নাবাস)

'বার্নাবাসের নামে প্রসিদ্ধ বাইবেলটি বার্নাবাসের নয়'- প্রমাণে এ দুটি আপত্তির কোনোটিই গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কেননা, কোনো গ্রন্থ আসমানী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য যদি "গ্রন্থটি কোনো নবীর মাধ্যমে লিখিত হওয়া এবং উক্ত নবী গ্রন্থটিকে যেভাবে রেখে গেছেন, হুবহু কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ছাড়া গ্রন্থটি 'অবিচ্ছিন্ন সূত্রে' পরবর্তীদের নিকট পৌঁছার বিষয়টি খ্রিস্টধর্মে স্বীকৃত শর্ত হয়, তবে তো এ সমীক্ষানীতি অনুসারে প্রসিদ্ধ কোনো বাইবেলই 'ঐশী গ্রন্থ' হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

দ্বিতীয়ত, প্রসিদ্ধ বাইবেলের বিরোধী বা বিপরীত বক্তব্য থাকা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সমর্থনে বক্তব্য থাকাও আশ্চর্যের মনে হবে না, যদি বার্নাবাস ও সেন্ট পলের ইতিহাস কিছুটা পর্যালোচনা করা হয়।

বার্নাবাস ছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারিয়্যিন বা সহচরদের উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী এবং অন্যতম সাহাবী।[২] বাইবেলের বর্ণনা মতে অলৌকিকভাবে দামেস্কের পথে যিশুর

দর্শন লাভ করে নিজেকে যিশুর অনুসারী দাবি করার আগে সেন্ট পল ছিলেন কট্টর ইহুদী এবং ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনে সিদ্ধহস্ত।[৩] প্রথম দিকে সেন্ট পলের ভূমিকা বুঝতে না পেরে বার্নাবাস তাকে ঈসা আলাইহিস সালামের অন্যান্য সহচরদের তার (সেন্ট পলের) ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন।[৪]

প্রাথমিক সময়ে বার্নাবাস এবং সেন্ট পল একই সাথে যিশুখ্রিস্টের ধর্ম প্রচারে ব্রত ছিলেন।[৫]

কিন্তু একপর্যায়ে তাদের উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা নিম্নরূপ–

"কিন্তু পৌল ও বার্নাবাস এন্টিয়কেই রইলেন। সেখানে তাঁরা আরো অনেকের সঙ্গে মাবুদের কালাম শিক্ষা দিতে ও তাবলীগ করতে থাকলেন। কিছুদিন পরে পৌল বার্নাবাসকে বললেন, 'যেসব জায়গায় আমরা মাবুদের কালাম তাবলীগ করেছি, চলো এখনই সেই সব জায়গায় ফিরে গিয়ে ঈমানদার ভাইদের সঙ্গে দেখা করি এবং তারা কেমনভাবে চলে তা দেখি। তখন বার্নাবাস ইউহোন্নাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। এই ইউহোন্নাকে মার্ক বলেও ডাকা হতো। পৌল কিন্তু তাকে সঙ্গে নেওয়া ভালো মনে করলেন না। কারণ মার্ক পামফুলিয়াতে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে আর কাজ করেননি। তখন পৌল ও বার্নাবাসের মধ্যে এমন মতের অমিল হলো যে তাঁরা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। বার্নাবাস মার্ককে নিয়ে জাহাজে করে সাইপ্রাস দ্বীপে গেলেন। আর পৌল সিলকে বেছে নিলেন।" (প্রেরিত ১৫ : ৩৫-৪১)

এ বিচ্ছেদের পর আবার তাঁদের সম্পর্ক পুনর্স্থাপিত হয়েছিল মর্মে গোটা বাইবেলে কোনো বর্ণনা নেই। তার মানে এ বিচ্ছেদ ছিল চিরতরের জন্য। সঙ্গী নির্বাচনের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একই আদর্শের অনুসারী দুই ব্যক্তির মাঝে এমন মারাত্মক মতবিরোধ হওয়াটা বিস্ময়কর। উপরন্তু তাঁদের এ মতবিরোধের ব্যাপারে প্রেরিত পুস্তকে লুক যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা অস্বাভাবিক কঠিন। মিস্টার এ এম ব্লেইকলক [Blaiklock] বলেন,

এবার লুক বিশ্বস্ততার সাথে (পৌল ও বার্নাবাস, এই দুই) সফর সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে দেখা দেওয়া বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি যে শব্দ ব্যবহার করেছেন [Paraxusmas] তা বড় কঠিন। ...নিউ টেস্টামেন্টে সে শব্দটি এ ছাড়া আর এক জায়গাতেই (প্রকাশিত কালাম ৬:১৪) ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে আকাশমণ্ডলী ধ্বংস হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। [Blaiklock , Commentory on Acts, edited by RVG tasker PP.118, 611]

কাজেই দৃঢ়ভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে তাঁদের উভয়ের মতবিরোধ ছিল আদর্শগত।[৬] অর্থাৎ সেন্ট পল যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের তাওহীদি ধর্মকে নিজস্ব মতাদর্শের রূপদানের চেষ্টা শুরু করেন, তখন বার্নাবাস তাঁকে পরিত্যাগ করেন। সেন্ট পল ও বার্নাবাসের এ আদর্শিক মতবিরোধকে সামনে রেখে যদি চিন্তা করা হয়, তবে এটা অসম্ভব মনে হয় না যে এর পরই বার্নাবাস সেন্ট পলের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য একটি সুসমাচার রচনা করবেন এবং তাতে সেন্ট পলের স্বরূপ উদঘাটনসহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের তাওহীদ ও একত্ববাদের বিরোধী ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অপনোদন করবেন!

কাজেই বার্নাবাসের বাইবেল রচনা করা এবং তাতে প্রসিদ্ধ সেন্ট পলীয় বাইবেলের বিরোধী কথা থাকা আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়; বরং বার্নাবাস যে সত্যিই পলবিরোধী একটি বাইবেল রচনা করেছিলেন, তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয় এ কারণে যে পশ্চিমা পণ্ডিত 'একসিহোমো' [Ecce Homo] তাঁর গ্রন্থে প্রাচীন খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ যিশুখ্রিস্ট বা তাঁর প্রেরিত শিষ্যগণ বা তাঁদের অনুসারীগণের নামে প্রচারিত যে সকল পুস্তক ও পত্রের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে সেগুলো অবলুপ্ত রয়েছে, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। অবলুপ্ত এ কিতাবসমূহের তালিকায় তিনি 'বার্নাবাসের বাইবেলে'র কথা স্বীকার করেছেন। 'এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা' (৩/২৬২)-তেও বার্নাবাসের বাইবেলের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের ইংরেজি অনুবাদক George Sale [জর্জ সেল] তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের [৭] ভূমিকায় এ অবলুপ্ত বাইবেলটি প্রাপ্তির যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তার সারমর্ম হলো, আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশপ ইরানিয়াসের লেখা কিছু চিঠি ল্যাটিন রাহিব (খ্রিস্টান সন্ন্যাসী) ফ্রামারিনোর হস্তগত হয়। যার একটিতে সেন্ট পলের কঠোর সমালোচনা এবং বার্নাবাসের বাইবেলের কথা উল্লেখ ছিল। ইরানিয়াসের এ চিঠি থেকে ফ্রামারিনো বার্নাবাসের বাইবেলের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে বন্ধুবর পোপ পঞ্চম সিক্সটাস [Sixtus]-এর ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে ইতালিয়ান ভাষায় বার্নাবাসের বাইবেলের একটি কপি ফ্রামারিনোর হস্তগত হয়।[৮]

সারকথা, বার্নাবাস কর্তৃক সেন্ট পলীয় বাইবেলের বিরোধী একটি বাইবেল রচনার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি বাস্তবিক পক্ষেই তা লিখিত হওয়া এবং প্রাপ্ত হওয়ার ঐতিহাসিক প্রমাণও রয়েছে। কাজেই 'প্রচলিত বাইবেলবিরোধী বক্তব্য থাকার কারণেই এটি কোনো মুসলমানের লেখা হতে হবে'–এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। উপরন্তু কয়েকটি বিষয় চিন্তা করলে এ সুসমাচারটি যেকোনো

মুসলমানের লেখা নয়, তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয়। পাঠক লক্ষ করুন–

ক. এ সুসমাচারের ভাষাশৈলী, পরিভাষা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে তা প্রথম খ্রিস্টীয় শতকেই লিখিত।

খ. ৭ম/৮ম খ্রিস্টীয় শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত শতশত মুসলিম পণ্ডিত খ্রিস্টধর্মের আলোচনা, সমালোচনা ও বাইবেলের আলোকে মুহম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কেউই কখনো বার্নাবাসের উদ্ধৃতি দেননি। যদি কোনো মুসলমান এটি লিখে থাকতেন, তবে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে সুসমাচারটির কথা অবশ্যই তিনি মুসলমানদের অবহিত করতেন; নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতেন না!

কাজেই খ্রিস্টধর্মের অনুসারীগণ যদি নির্ভরযোগ্য সূত্র না থাকার পরও প্রসিদ্ধ বাইবেলসমূহকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিতে পারেন, তাহলে বার্নাবাসের বাইবেলকেও গ্রহণযোগ্য মেনে নেওয়াটা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে যায় (যদিও মুসলমানদের নিকটে কোনো বাইবেলই প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত নয়)।

জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা–০১

খ্রিস্টধর্মে অনুসরণীয় কে? যিশুখ্রিস্ট, নাকি সেন্ট পল?

বর্তমান খ্রিস্টসমাজ নিজেদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী দাবি করে থাকে। কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল বলছে ভিন্ন কথা। বাইবেলের বর্ণনা দ্বারা বর্তমান খ্রিস্টসমাজ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নয়; বরং সেন্ট পলের অনুসারী বলে প্রতীয়মান হয়। প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত ঈসা আলাইহিস সালামের কথা ও কাজের সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ইহুদী বংশোদ্ভূত সেন্ট পল খ্রিস্টধর্মের নামে সুকৌশলে খ্রিস্টানদের মধ্যে নিজস্ব মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়।

পল ছিলেন বিত্তশালী রোমীয় পিতার সন্তান। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। রোমীয়, গ্রিক পৌত্তলিকদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সেন্ট পল রোমান, গ্রিক অবিশ্বাসী ও দার্শনিক প্লেটোর মতবাদকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আনীত মূল শিক্ষার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটান। এভাবে তাঁর হাতে খ্রিস্টধর্ম একই সঙ্গে গ্রিক, পুরান, রোমীয় উপকথা, মিসরীয়, প্লেটোর দর্শন, সন্ন্যাস ধর্ম প্রভৃতি মতবাদের সমন্বিত রূপে পরিণত হয়।

আমরা শিরোনামের আলোচনা শুরু করার পূর্বে এবং সেন্ট পল উদ্ভাবিত খ্রিস্টবাদের মূল ভিত্তি এবং এর বিপরীতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আনীত তাওহীদ ও একত্ববাদের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য জানার আগে প্রথমে সেন্ট পলের পরিচয় তুলে ধরছি–

সেন্ট পলের জন্ম ও ধর্ম পরিচয়

সেন্ট পলের (Paul) মূল নাম সল (Saul)। তিনি বর্তমান তুরস্কের তারসুস (Tarsus) বা সাইলেশিয়া (Cilicia)-অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।[৯] তিনি জাতিতে রোমীয় মাতৃভাষায় গ্রিক এবং ধর্মে ইহুদী ছিলেন।[১০]

ধর্মে ইহুদী হলেও ইহুদী ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সামান্যই। তবে তিনি গ্রিক-রোমান ধর্ম ও দর্শনে ব্যাপক অভিজ্ঞ ছিলেন। সেন্ট পল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় তিনি তাঁকে কখনো দেখেননি।

যৌবনকালে তিনি হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর ধর্মাচার ও ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "আমি ইহুদী, সাইলেশিয়ার তারসুস নগরে আমার জন্ম; কিন্তু এই নগরে গমলীয়েলের চরণে মানুষ হইয়াছি, পৈতৃক ব্যবস্থার সূক্ষ্ম নিয়মানুসারে শিক্ষিত হইয়াছি; আর আপনারা সকলে অদ্যাপি যেমন আছেন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের পক্ষে উদ্যোগী ছিলাম।" (প্রেরিত ২২:৩) [১১]

অন্যত্র তিনি স্বীয় ধর্ম পালন প্রসঙ্গে বলেন, "আমি অষ্টম দিনে ত্বক্‌ছেদপ্রাপ্ত, ইস্রায়েল জাতীয় বিন্যামীন বংশীয়, ইব্রীকুলজাত ইব্রীয়, ব্যবস্থার সম্বন্ধে (মূসার শরীয়ত পালনের ব্যাপারে আমি একজন) ফরীশী," (ফিলিপীয় ৩:৫) [১২]

সুতরাং বোঝা গেল, পল ছিলেন একজন গোঁড়া ইহুদী ও ধর্মান্ধ ফরীশী। এর ব্যাখ্যাও তাঁর জবানীতে শুনুন–

"বাল্যকাল অবধি আমার আচার-ব্যবহার, যাহা আদি হইতে স্বজাতীয়দের মধ্যে এবং যিরূশালেমে হইয়া আসিয়াছে, তাহা যিহূদীরা সকলেই জানে; তাহারা প্রথমাবধি আমাকে জ্ঞাত হওয়াতে ইচ্ছা করিলে এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাচারী (গোঁড়া) সম্প্রদায় অনুসারে আমি ফরীশী মতে জীবন যাপন করিতাম।" (প্রেরিত ২৬:৪–৫) [১৩]

সেন্ট পলের প্রাথমিক জীবন

প্রথম জীবনে পল ছিলেন মূলত হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষী এবং খ্রিস্ট ধর্মমতের ঘোর বিরোধী। পলের নিজের বর্ণনায় শুনুন–

ক. "আমি প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পথের (যিশুর পথে যারা চলত) প্রতি উপদ্রব করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতাম।" (প্রেরিত ২২:৪) [১৪]

খ. এ সম্পর্কে পল আরো বলেন, "আর সমস্ত সমাজ-গৃহে বারবার তাঁহাদিগকে শাস্তি দিয়া বলপূর্বক ধর্মনিন্দা করাইতে চেষ্টা করিতাম এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অতিমাত্র উন্মত্ত হইয়া বিদেশীয় নগর পর্যন্তও তাঁহাদিগকে তাড়না করিতাম।" (প্রেরিত ২৬:১১) [১৫]

গ. এসব করতেন পল তাঁর ইহুদী ধর্মান্ধতার কারণে। এ ব্যাপারে পল বলেন, "আমিই ত মনে করিতাম যে, নাসরতীয় যিশুর নামের বিরুদ্ধে অনেক কার্য করা আমার কর্তব্য। আর আমি যিরূশালেমে তাহাই করিতাম; প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া পবিত্রগণের মধ্যে অনেককে আমি কারাগারে বদ্ধ করিতাম, ও তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করিতাম;" (প্রেরিত ২৬:৯-১০)[১৬]

ঘ. পল এ ক্ষেত্রে সীমাহীন চরমপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এ সম্পর্কে পল বলেন, "তোমরা ত যিহূদী-ধর্মে আমার পূর্বকার আচার-ব্যবহারের কথা শুনিয়াছ; আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করিতাম ও তাহা উৎপাটন করিতাম" (গালাতীয় ১:১৩) [১৭]

সেন্ট পলের যিশু দর্শন এবং খ্রিস্টানত্রাতা রূপে আবির্ভাব

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমানে আরোহনের পর তাঁর প্রেরিত সহচর ও অনুসারীরা তাঁর আনীত ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। কিন্তু ইহুদীরা সহজাত শত্রুতাবশত তাঁর ধর্মকে সমূলে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। এ জন্য তারা তাঁর অনুসারীদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়। ইহুদী সেন্ট পলও ছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শত্রুদের অন্যতম।

কিন্তু এভাবে শত জুলুম-অত্যাচার করেও পল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের তাদের ধর্ম থেকে ফেরাতে পারলেন না। এবার তিনি কূটকৌশলের আশ্রয় নিলেন; বন্ধুবেশে শত্রুতার পথ অবলম্বন করলেন। তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মটিকেই ক্ষত-বিক্ষত করে ধ্বংস করার দুরভিসন্ধি আঁটলেন এবং সে মতে নিজেকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত বলে আত্মপ্রকাশ করলেন।

ঘটনাক্রমে এ সময় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ১২ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে জুদাসের শূন্য পদটি পূর্ণ করার অজুহাত পাওয়া গেল। কারণ বনী ইসরাঈলের ১২টি গোত্রের বিচার-বিবেচনা করার জন্য নাকি ১২ জন শিষ্যের জন্য ১২টি সিংহাসন রয়েছে।

"যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার মেজে [ভোজন জলসায়] ভোজন পান করো; আর তোমরা সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।" (লুক ২২:৩০) [১৮]

তখন পিতর জবাবে তাঁকে বললেন, "দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করে আপনার অনুসারী হয়েছি; আমরা তবে কী পাইব?" যিশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যতজন আমার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছ, পুনঃ সৃষ্টিকালে, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।" (মথি ১৯:২৭-২৮) [১৯]

সেন্ট পল এ শূন্য পদটি পূর্ণ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে যিশুর ত্রয়োদশতম প্রেরিত বলে দাবি করে বসলেন এবং তিনি এ ব্যাপারে খ্রিস্টানদের নানাভাবে প্রভাবিত করলেন। নমুনা দেখুন–

"পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রিস্ট যিশুর প্রেরিত এবং তীমথিয় ভ্রাতা কলসিতে যে সকল পবিত্র লোক ও বিশ্বস্ত ভ্রাতা খ্রিস্টে আছেন, তাঁহাদের সমীপে।" (কলসীয় ১:১-২) [২০]

এ পর্যায়ে পল 'প্রেরিত' পদলাভ ও খ্রিস্টধর্মের কাণ্ডারি দাবির বৈধতা প্রমাণ করে সমাজের নিকট বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য এক অভিনব কাহিনী তৈরি করলেন। তিনি রাজা অগ্রিপের কাছে গিয়ে বললেন–

"এই উপলক্ষে প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা ও আজ্ঞাপত্র লইয়া আমি দম্মেশকে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে হে রাজন্, মধ্যাহ্নকালে পথিমধ্যে দেখিলাম, আকাশ হইতে সূর্যতেজ অপেক্ষাও তেজোময় জ্যোতি আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারিদিকে দেদীপ্যমান। তখন আমরা সকলে ভূমিতে পতিত হইলে আমি এক বাণী শুনিলাম, উহা ইব্রীয় ভাষায় আমাকে বলিল, শৌল, শৌল, (পৌল) কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর। তখন আমি বলিলাম, প্রভু, আপনি কে? প্রভু কহিলেন, আমি যিশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ? কিন্তু ওঠো, তোমার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, তুমি যে যে বিষয়ে আমাকে দেখিয়াছ, ও যে যে বিষয়ে আমি তোমাকে দর্শন দেব, সেই সকল বিষয়ে যেন তোমাকে সেবক ও সাক্ষী নিযুক্ত করি, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে দর্শন দিলাম। আমি যাহাদের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি, সেই প্রজালোকদের ও পরজাতীয় লোকদের হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, যেন তুমি তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দাও, যেন তাহারা অন্ধকার হইতে জ্যোতির প্রতি এবং শয়তানের কর্তৃত্ব হইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসে, যেন আমাতে বিশ্বাস করণ দ্বারা পাপের মোচন ও পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়।" (প্রেরিত ২৬:১২-১৮) [২১]

সেন্ট পল কর্তৃক বারবার যিশুর দর্শন লাভের দাবি

সেন্ট পল নিজের দাবি বিশ্বাসযোগ্য বানানোর জন্য একেক সময় একেক রূপ নিয়ে খ্রিস্টানদের নিকট গিয়ে যিশুর দর্শন লাভ ও বিভিন্ন বাণী হাসিলের দাবি করেন–

ক. দামেস্কের পথে হযরত ঈসা মসীহের প্রথম দর্শন লাভের দাবির পর পল করীন্ত শহরে ধর্মপ্রচারের সময় দ্বিতীয়বার যিশুর দর্শন লাভ করার দাবি করেন। লুক লিখেছেন, "আর প্রভু রাত্রিকালে দর্শনযোগে পৌলকে

কহিলেন, ভয় করিও না, বরং কথা বলো, নীরব থাকিও না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার ক্ষতি করণার্থে কেহই তোমাকে আক্রমণ করিবে না; কেননা এই নগরে আমার অনেক প্রজা আছে। তাহাতে তিনি দেড় বৎসর অবস্থিতি করিয়া তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন।" (প্রেরিত ১৮:৯-১১) [২২]

খ. তারপর জেরুজালেমে যাওয়ার পর পল তৃতীয়বার দর্শন লাভের দাবি করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

"তাহার পরে আমি যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়া এক দিন ধর্মধামে প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে কহিলেন, ত্বরা করো, শীঘ্রই যিরূশালেম হইতে বাহির হও, কেননা এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবে না।" (প্রেরিত ২২:১৭-১৮) [২৩]

গ. এরপর পল চতুর্থবার যিশুর দর্শন লাভের দাবি করেছেন। শেষবার যখন তিনি বন্দি হয়েছিলেন এবং ইহুদী মহাসভার সামনে তাঁকে উপস্থিত করা হয়েছিল, তখন এই দর্শন লাভের দাবি করেন। এ সম্পর্কে লুক লিখেছেন, "পর রাত্রিতে প্রভু পলের নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, সাহস করো, কেননা আমার বিষয়ে যেমন যিরূশালেমে সাক্ষ্য দিয়াছ, তদ্রূপ রোমেও দিতে হইবে।" (প্রেরিত ২৩:১১) [২৪]

এভাবে পল বারবার যিশুর দর্শন ও তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাণী লাভ করার দাবি করেন। আর এ পথ ধরেই তিনি যিশুর নামে খ্রিস্টানদের মধ্যে নানা ভ্রান্ত মতবাদের জন্ম দেন। আর ক্রমে পলের সেই বানানো মতবাদগুলো গ্রহণ করে খ্রিস্টান বন্ধুরা সেগুলোকেই তাঁদের ধর্মরূপে পালন করতে শুরু করেন। যার ফলে আজ খ্রিস্টধর্মে মহান আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসের এবং হযরত ঈসা আনীত শরীয়ত অনুশীলন ও পালন বাদ দিয়ে শুধু যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস দ্বারা মুক্তি লাভের অমূলক, অযৌক্তিক ও গর্হিত ধর্মবিশ্বাস স্থান লাভ করেছে।

ঈসা মসীহের 'প্রেরিত' হওয়ার দাবি

প্রেরিতগণ নবীর স্থলাভিষিক্তরূপে দ্বীনের কাজ পরিচালনা করতেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ১২ জন শিষ্য 'প্রেরিত' পদ লাভ করেছিলেন। পলও সেরূপ প্রেরিত হওয়ার দাবি করেন।

ক. এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পৌল প্রেরিত মনুষ্যদের হইতে নয়, মনুষ্যের দ্বারাও নয়, কিন্তু যিশুখ্রিস্টের দ্বারা এবং যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন, সেই পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত..." (গালাতীয় ১:১) [২৫]

খ. তিনি আরো বলেন, "কিন্তু যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ হইতে পৃথক করিয়াছেন এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহবান করিয়াছেন..." (গালাতীয় ১:১৫) [২৬]

গ. অন্যত্র তিনি বলেন, "কারণ আমার বিচার এই যে, সেই প্রেরিত-চূড়ামণিদের হইতে আমি একটুও পেছনে নহি। কিন্তু যদিও আমি বক্তৃতায় সামান্য, তথাপি জ্ঞানে সামান্য নই, ইহা আমরা সর্ববিষয়ে সকল লোকের মধ্যে তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছি।" (২করীন্থীয় ১১:৫-৬) [২৭]

পল কাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন?

ক. প্রেরিত হওয়ার পর তাঁর কর্মক্ষেত্র কোথায় হবে, সে ব্যাপারে পল নিজেই বলেন, "বরং পক্ষান্তরে যখন দেখিলেন, ছিন্নত্বক্‌দের (ইহুদীদের) মধ্যে যেমন পিতরকে, তেমনি অচ্ছিন্নত্বক্‌দের (অ-ইহুদীদের) মধ্যে আমাকে সুসমাচারের ভার দত্ত হইয়াছে। কারণ ছিন্নত্বক্‌দের কাছে প্রেরিতত্ব-কর্মের নিমিত্তে যিনি পিতর কর্তৃক কার্য সাধন করিলেন, তিনি পরজাতিগণের নিমিত্তে আমা কর্তৃকও কার্য সাধন করিলেন..." (গালাতীয় ২:৭-৮) [২৮]

খ. পল আরো বলেন, "তিনি আমাকে কহিলেন, প্রস্থান করো, কেননা আমি তোমাকে দূরে পরজাতিগণের (অ-ইহুদীদের) কাছে প্রেরণ করিব।" (প্রেরিত ২২:২১) [২৯]

গ. অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "এই জন্য আমি পৌল, তোমাদের অর্থাৎ পরজাতীয়দের নিমিত্ত খ্রিস্ট যিশুর বন্দি (প্রেরিত হয়েছি)- ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-বিধান তোমাদের উদ্দেশ্যে আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহার কথা তোমরা ত শুনিয়াছ।" (ইফিষীয় ৩:১-২) [৩০]

এসব বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, পল তাঁর দাবি অনুযায়ী অ-ইহুদীদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনা তাঁর এ কথাকে সমর্থন করে না। বরং সেই বর্ণনা এর থেকে ভিন্ন।

লুকের বাইবেলে রয়েছে, "কিন্তু প্রভু (যিশু) তাঁহাকে (অননিয়কে) কহিলেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে (পৌল) আমার মনোনীত পাত্র।" (প্রেরিত ৯:১৫) [৩১]

এ বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, ইহুদীদের মাঝে প্রচার করার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য প্রথম প্রথম ইহুদীদের নিকট প্রচারকার্য শুরুও করেছিলেন তিনি।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অ-ইহুদীদের কাছে প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে ইহুদীদের নিকট কেন তিনি প্রচারকাজ শুরু করলেন? আর সবার নিকট প্রচারের জন্য মনোনীত হলে ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যগণ ও প্রেরিতগণ তাহলে কী কাজের জন্য ছিলেন? তা ছাড়া পল কেনইবা বলেছেন, ইহুদীদের নিকট প্রচার করার ভার যেমন পিতরকে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি অ-ইহুদীদের নিকট প্রচার করার ভার খোদা আমার

ওপর দিয়েছেন?

পলের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ

সেন্ট পল যেহেতু প্রাথমিক যুগে খ্রিস্টানবিদ্বেষী এবং নির্যাতনকারী কট্টর ইহুদী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, কাজেই 'প্রেরিত' পদ লাভের পরও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারীরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেননি। এমনকি তাঁকে তারা ভয় করত। সেন্ট পলের অসত্য দাবিতে বিভ্রান্ত হয়ে যিশুর অনুসারী বার্নাবাস তাদের এ ভয় দূর করার জন্য চেষ্টা করেন। এ মর্মে লুক লিখেছেন,

"পরে তিনি (পল) যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকলে তাঁহাকে ভয় করিল, তিনি যে শিষ্য, ইহা বিশ্বাস করিল না। তখন বার্নাবাস তাঁহার হাত ধরিয়া প্রেরিতদের নিকটে লইয়া গেলেন, এবং পথের মধ্যে তিনি কিরূপে প্রভুকে দেখিতে পাইয়াছেন, ও প্রভু যে তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন এবং কিরূপে তিনি দম্মেশকে যিশুর নামে সাহসপূর্বক প্রচার করিয়াছেন, এই সকল তাঁহাদের কাছে বর্ণনা করিলেন। আর শৌল যিরূশালেমে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, ভিতরে আসিতেন ও বাহিরে যাইতেন, প্রভুর নামে সাহসপূর্বক প্রচার করিতেন।" (প্রেরিত ৯:২৬-২৮) [৩২]

সেন্ট (সাধু) হিসেবে পরিচিত হওয়ার নিমিত্তে আরবে তিন বছর নির্জনবাস!

'প্রেরিত' পদ লাভের দাবির পর পল কিছুদিন দামেস্কে কাটান। তারপর সবার অগোচরে আরব দেশ তথা দামেস্কের দক্ষিণাঞ্চলে চলে যান। এ ব্যাপারে পল নিজেই লিখেছেন,

"তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করিবার সুবাসনা করিলেন, যেন আমি পরজাতিগণের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি ক্ষণমাত্রও রক্ত-মাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না এবং যিরূশালেমে আমার পূর্ববর্তী প্রেরিতগণের কাছে গেলাম না, কিন্তু আরব দেশে চলিয়া গেলাম, পরে দম্মেশকে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর তিন বৎসর গত হইলে কৈফার (পিতরের) সহিত পরিচিত হইবার নিমিত্তে যিরূশালেমে গেলাম এবং পনেরো দিন তাঁহার কাছে রহিলাম। কিন্তু প্রেরিতগণের মধ্যে অন্য কাহাকেও দেখিলাম না, কেবল প্রভুর ভ্রাতা যাকোবকে দেখিলাম।" (গালাতীয় ১:১৬-১৯) [৩৩]

পর্যালোচনা : যিশুর দর্শন লাভ প্রসঙ্গ

রাজা অগ্রিপের কাছে গিয়ে যিশুর দর্শন লাভের মাধ্যমে প্রেরিত পদ লাভের যে ঘটনা সেন্ট পল বর্ণনা করেছেন, বস্তুত এ ঘটনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। কেননা,

ক. যদি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সত্যিই তাঁকে শিষ্যত্ব প্রদান করতেন, তবে এর দাবি তো এ-ই ছিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ ফিলিস্তিনে এসে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারী হাওয়ারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাদের নিকট থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের ইঞ্জিল শরীফ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু তা না করে তিনি তাদের থেকে দূরে থাকলেন[৩৪] এবং ইঞ্জিলের কোনো জ্ঞান লাভ না করেই শুধু একবার একটু আলোক দর্শন ও কথা শ্রবণকেই তাঁর পয়গম্বরীর জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য করলেন! এমনকি বারবার ঘোষণা করতে থাকলেন যে তাঁর নিজের ইঞ্জিল ছাড়া অন্য কোনো ইঞ্জিল, অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের মূল ইঞ্জিল যদি কেউ প্রচার করে তবে সে অভিশপ্ত!![৩৫]

খ. সেন্ট পল একজন আত্মস্বীকৃত মিথ্যাবাদী। তার প্রমাণ খোদ বাইবেলেই রয়েছে। তিনি বলেন, 'কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন? (রোমীয় ৩:৭)[৩৬]

গ. সেন্ট পল দাবি করেছিলেন যে যিশু তাঁকে বলেছিলেন, "তোমার নিজের লোকদের (ইহুদীদের) এবং অ-ইহুদীদের হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব।" কিন্তু বাস্তবে তাঁর কথিত এ ওয়াদা কার্যকর হয়নি। কেননা ৬২ খ্রিস্টাব্দের দিকে রোমীয় সরকার তাঁকে বন্দি করে এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।[৩৮]

ঘ. যিশুর দর্শনলাভের ব্যাপারে যে ঘটনা পল উল্লেখ করেছেন, তাতে বেশ স্ববিরোধিতা রয়েছে। আমরা ভেবে পাই না, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় একজন জ্ঞানী মানুষ এত স্ববিরোধী কথা কিভাবে বলতে পারে? লক্ষ করুন–

= লুক বললেন, "আর তাঁহার (পলের) সহপথিকেরা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহারা ঐ বাণী শুনিল বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।" (প্রেরিত ৯:৭)[৩৯]

= (পল বললেন,)"আর যাহারা আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা সেই আলো দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু যিনি আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তাঁহার বাণী শুনিতে পাইল না।" (প্রেরিত ২২:৯)[৪০]

= পল বললেন, "তখন আমরা সকলে ভূমিতে পতিত হইলে আমি এক বাণী শুনিলাম, উহা ইব্রীয় ভাষায় আমাকে বলিল, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর।" (প্রেরিত ২৬:১৪)[৪১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে বিভিন্ন রকম বৈপরীত্য দেখা যায়। যেমন–

ক. প্রথম উদ্ধৃতি প্রেরিত ৯:৭-এর বিবরণে দেখা যায়, পলের সহযাত্রীরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অথচ দ্বিতীয় উদ্ধৃতি প্রেরিত ২৬:১৪-এর বিবরণে বলা হয়েছে, পৌলসহ তারা মাটিতে পড়ে গেল।

খ. প্রথম উদ্ধৃতির বিবরণে বলা হয়েছে, তারা সে বাণী শুনল। অথচ প্রেরিত ২২:৯-এর বিবরণে বলা হয়েছে, তারা

বাণী শুনতে পেল না।

গ. প্রেরিত ২২:৯-এর বিবরণে বলা হয়েছে, তারা সে আলো দেখল। অথচ প্রেরিত ৯:৭-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, তারা কাউকেই দেখতে পেল না।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে পরস্পরবিরোধী অসংগতিপূর্ণ বিবরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে সেন্ট পলের এ অসত্য ঘটনা পরিকল্পিতভাবে বাইবেলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আরবে নির্জনবাস প্রসঙ্গ

পল ঈসা মসীহের প্রেরিতদের কাছ থেকে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাগ্রহণ না করে, এমনকি তাদের সাথে কোনোরূপ পরামর্শও না করে আরবে নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন। এর পেছনে দুটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়–

১. পল সত্যিই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে থাকলে জেরুজালেমে গিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যগণের ও প্রেরিতগণের কাছ থেকে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষাগ্রহণ করলেন না কেন?

২. দূরদেশ আরবে গিয়ে পলের তিন বছরের নির্জনবাসের রহস্য কী?

প্রথম প্রশ্নের জবাব পলের নিজের বক্তব্যেই পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

"কেননা, হে ভ্রাতৃগণ, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, তাহা মানুষের মতানুযায়ী নয়। কেননা আমি মানুষের নিকট হইতে তাহা গ্রহণও করি নাই, এবং শিক্ষাও পাই নাই; কিন্তু যিশুখ্রিস্টের প্রত্যাদেশ দ্বারা পাইয়াছি। তোমরা ত যিহূদী-ধর্মে আমার পূর্বকার আচার-ব্যবহারের কথা শুনিয়াছ; আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করিতাম ও তাহা উৎপাটন করিতাম; আর পরম্পরাগত পৈতৃক রীতিনীতি পালনে অতিশয় উদ্যোগী হওয়াতে আমার স্বজাতীয় সমবয়স্ক অনেক লোক অপেক্ষা যিহূদী-ধর্মে উত্তর উত্তর অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ হইতে পৃথক করিয়াছেন এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করিবার সুবাসনা করিলেন, যেন আমি পরজাতিগণের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি ক্ষণমাত্রও রক্ত মাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না এবং যিরূশালেমে আমার পূর্ববর্তী প্রেরিতগণের কাছে গেলাম না, কিন্তু আরব দেশে চলিয়া গেলাম, পরে দম্মেশকে ফিরিয়া আসিলাম।" (গালাতীয় ১:১১-১৭)[৪২]

সেন্ট পলের এ বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি কেনো ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। এর সহজ সমীকরণ হলো, তিনি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত এবং খোদ খ্রিস্ট কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এ ধর্মের পিতৃত্বের আসনে পৌঁছে গেছেন এবং জাতির পিতা হিসেবে এ ধর্মের ভিত্তি স্থাপনের নিগূঢ় মতলবে আছেন, কাজেই তাঁর তো হাওয়ারীগণসহ অন্য কোনো খ্রিস্টীয় ধর্মজ্ঞের কাছ থেকে এ ধর্মের পাঠগ্রহণের কথা নয় এবং পাঠগ্রহণ যুক্তিযুক্তও নয়। বরং অন্য সকলেরই কর্তব্য হবে তাঁর থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী নিজেদের ধর্মমতকে পুনর্বিন্যস্ত করা!

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন তথা তিন বছর আরবে নির্জনবাস গ্রহণের রহস্যের বিষয়ে আসা যাক। এ ব্যাপারে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধকার লিখেছেন,

"শীঘ্রই তাঁর (পলের) এমন কোনো নিরিবিলি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ হলো, যেখানে তিনি নতুন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবেন। সুতরাং তিনি দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে চলে গেলেন। তাঁর সামনে তখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, নিজের নবলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে শরীয়তের নতুন ব্যাখ্যা দান করা।" (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা : নিবন্ধ : পল)

এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, পলের উদ্দেশ্য ছিল–ঈসা মসীহের প্রকৃত দ্বীনের পরিবর্তে একটি নতুন ধর্মের গোড়াপত্তন করা এবং খ্রিস্টধর্মকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা। এ হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল নীরবে-নিভৃতে বিষয়টির সার্বিক পরিকল্পনা এবং নকশা প্রস্তুত করা। তিনটি বছর এর জন্য যথেষ্ট সময় বৈকি!

আধুনিক বাইবেল-বিশেষজ্ঞগণের মতে সেন্ট পলের প্রেরিতত্ব

আধুনিক বাইবেল-বিশেষজ্ঞগণ পলের প্রেরিত পদলাভ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছেন। এ কারণে বর্তমান খ্রিস্টধর্ম যে সেন্ট পলের সৃষ্টি–তা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়।

ক. এ ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের যুরিখ (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের (Theology) অধ্যাপক ডা. আর্নল্ড মায়ারের (Dr. Arnold Meyer) বক্তব্য তুলে ধরা হলো। তিনি বলেন,

If by Christianity we understand faith in Christ as the heavenly Son of God Who did not belong to earthly humanity, but Who lived in the Divine likeness and glory, Who came down from Heaven to earth, Who entered into humanity and took upon Himself a human form that He might make propitiation for men's sin by His own blood upon the Cross, Who was then awakened from death and raised to the Right Hand of God as the Lord of His own people, Who now intercedes for those who

believe in Him, hears their prayers, guards and leads them, Who, moreover, dwells and works personally in each of those who believe in Him, Who will come again with the clouds of Heaven to judge the World, Who will cast down all the foes of God, but will bring His own people with Him into the home of heavenly light so that they may become like unto His glorified body — if this is Christianity, then such Christianity was founded principally by St. Paul and not by our Lord.[৪৩]

"খ্রিস্টধর্ম বলতে যদি আমরা যিশুকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করাকেই বুঝি– যিনি পার্থিব মনুষ্যজাতির অংশভুক্ত ছিলেন না, বরং গৌরবে ঈশ্বরের সমান হয়ে স্বর্গীয় প্রতিকৃতিসহ বাস করতেন, যিনি স্বর্গ হতে অবতার হয়ে ধরায় নেমে এসেছিলেন, যিনি নিজেই মানব আকৃতিতে পুত্রের রূপ ধারণ করে কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাতে ক্রুশকাষ্ঠে নিজ রক্ত দিয়ে মানবজাতির সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন–অতঃপর কবর হতে পুনরুত্থান করা হলো এবং তাঁর নিজের লোকদের প্রভু হিসেবে তিনি খোদার ডান দিকে বসলেন, যাতে তারা তাঁকে খোদা বলে বিশ্বাস করে–যিনি তাদের প্রার্থনা শুনেন, পাপ হতে উদ্ধার করেন এবং বিপদ হতে রক্ষা করেন, যিনি সমগ্র জাতির বিচার করার জন্য আকাশে মেঘযোগে পুনরায় আগমন করবেন, যিনি ঈশ্বরের সকল শত্রুদেরকে নিক্ষেপ করবেন এবং নিজের লোকদেরকে সঙ্গে করে স্বর্গীয় আলোর দিকে নিয়ে যাবেন যাতে তারা তাঁর গৌরবান্বিত শরীরের প্রধান অঙ্গ হতে পারে–এ-ই যদি খ্রিস্টধর্ম হয়ে থাকে, তবে খ্রিস্টধর্ম আমাদের যিশু কর্তৃক নয়, বরং সেন্ট পল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

খ. ডা. মরিস বুকাইয়ে (Dr. Maurice Bucaille) তাঁর The Bible, The QurOan and Science গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় বলেন–

Paul is the most controversial figure in Christianity. He was considered to be a traitor to Jesus's thought by the latter's family and by the apostle who had stayed in Jerusalem in the circle around James. Paul created Christianity at the expense of those whom Jesus had gathered around him to spread his teachings.

"পল খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ঈসা মসীহের পরিবার এবং শিষ্যগণ জেরুজালেমে (ঈসা আলাইহিস সালামের ভাই) জেমসের (যাকোবের) চারপাশে জমায়েত ছিলেন এবং তাঁরা সাধু পলকে মাসীহের চিন্তা-চেতনার বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করতেন। ঈসা মসীহের শিক্ষা প্রচারের জন্য যাদেরকে জমায়েত করেছিলেন সাধু পল তাদের বিপরীতে একটি খ্রিস্টধর্ম তৈরি করেন।"

গ. খ্রিস্টান পণ্ডিত Heinz Zahrnt বলেন,

Paul especially-John is usually looked on a little more favorably-becomes the 'corrupter of the gospel of Jesus.'[৪৪]

অর্থাৎ "সেন্ট পল হলো ইঞ্জিল এবং প্রকৃত খ্রিস্টধর্মের বিকৃতকারী।"

ঈসা মসীহের শিষ্যদের নিকট নতুন মতবাদের প্রচার

প্রথম দিকে পল তাঁর নতুন মতবাদ বিভিন্ন দেশে প্রচার করলেও ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের নিকট তা প্রকাশ করেননি। গোপনে তা তাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন চৌদ্দ বছর পর।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "পরে চৌদ্দ বৎসর গত হইলে আমি বার্নবার সহিত পুনরায় যিরূশালেমে গেলাম, তীতকেও সঙ্গে লইলাম। আর প্রত্যাদেশক্রমে গমন করিলাম এবং যে সুসমাচার পরজাতিগণের মধ্যে প্রচার করিয়া থাকি, তথাকার লোকদের কাছে তাহার ব্যাখ্যা করিলাম, কিন্তু যাঁহারা গণ্যমান্য, তাঁহাদের কাছে বিরলে (গোপনে) করিলাম, পাছে [দেখা যায় যে] আমি বৃথা দৌড়াইতেছি বা দৌড়াইয়াছি।" (গালাতীয় ২:১-২)[৪৫]

পলের মতবাদ এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীনের মাঝে তুলনা

সেন্ট পলের উদ্ভাবিত ঈসায়ী ধর্মের মূল ভিত্তি হলো–

১. Trinity (ত্রিত্ববাদ), যিশুর ও পাক রুহের ঈশ্বরত্ব (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ)

২. Crucifixion তথা যিশুকে (ঈসা আলাইহিস সালামকে) ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ)

৩. The Atonement তথা 'যিশু ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ)

৪. শরীয়তের বিধি-বিধান বাতিল হওয়া ইত্যাদি।

৫. খাতনা (পুংলিঙ্গের ত্বকছেদন) বিধান রহিত করা।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়ত বাতিলকরণ

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তকে অস্বীকার করে পল বলেন,

ক. "ব্যবস্থা (শরীয়ত) ত ক্রোধ (খোদার গজব) সাধন করে; কিন্তু

যেখানে ব্যবস্থা নাই, সেখানে ব্যবস্থা লঙ্ঘনও নাই।" (রোমীয় ৪:১৫)[৪৬]

খ. তিনি আরো বলেন, "কেননা পাপ তোমাদের ওপরে আর কর্তৃত্ব করিবে না; কারণ তোমরা ব্যবস্থার (মূসার শরীয়তের) অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন।" (রোমীয় ৬:১৪)[৪৭]

গ. তিনি আরো বলেন, "তিনিই আমাদিগকে নূতন নিয়মের পরিচারক, অক্ষরের নয়, কিন্তু আত্মার পরিচারক হইবার উপযুক্তও করিয়াছেন; কারণ অক্ষর (শরীয়ত) বধ করে, কিন্তু আত্মা (পাক-রূহ্) জীবনদায়ক।" (২ করীন্থীয় ৩:৬) [৪৮]

ঘ. তিনি অন্যত্র বলেন, "তথাপি বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কেবল যিশুখ্রিস্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়। সেই জন্য আমরাও খ্রিস্ট যিশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্যহেতু নয়, কিন্তু খ্রিস্টে বিশ্বাসহেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্যহেতু কোনো মনুষ্য ধার্মিক গণিত হইবে না।" (গালাতীয় ২:১৬)[৪৯]

ঙ. তিনি অন্য স্থানে বলেন : "আমরা এও জানি, কোনো সৎ লোকের জন্য এই শরীয়ত দেওয়া হয়নি।" "ইহা জানিয়া করে যে, (ব্যবস্থা তথা শরীয়ত) ধার্মিকের জন্য নহে, কিন্তু যাহারা অধর্মী ও অদম্য, ভক্তিহীন ও পাপী, অসাধু ও ধর্মবিরূপক, পিতৃহন্তা ও মাতৃহন্তা, ... তাহার জন্য ব্যবস্থা (শরীয়ত) স্থাপিত হইয়াছে।" (১ তিমথীয় ১:৯-১০)[৫০]

চ. অন্যত্র বলেন : "কিন্তু শরীয়ত ঈমানমূলক নয়।" (কিতাবুল মোকাদ্দস : গালাতীয় ৩:১২)[৫১]

এভাবে পল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তকে প্রত্যাখান করেছেন। এমনকি তাঁর পরিবর্তে নিজেকেই একজন শরীয়ত প্রণেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

পলের এ বক্তব্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীনের সম্পূর্ণ বিরোধী। এমনকি বাইবেলে বিদ্যমান হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণীর সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, 'মনে করো না আমি তাওরাত কিতাব এবং নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি; বরং পূর্ণ করতে এসেছি। ...মূসার শরীয়তের মধ্য থেকে ছোট একটা হুকুমও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে। কিন্তু যে কেউ শরীয়তের হুকুমগুলো পালন করে ও শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে বড় বলা হবে। আমি তোমাদেরকে বলছি যে, আলেম ও ফরীশীদের ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশি কিছু না থাকে তবে তোমরা কোনোমতেই বেহেশতী রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। (মথি ৫:১৭-২০)[৫২]

খাতনা (পুংলিঙ্গের ত্বক্‌ছেদন) বিধান রহিত করা

ছেলেদের খাতনা করানো নবীগণের সুন্নাত-আদর্শ। এর বিধান হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে চলে আসছে। কিন্তু পল এর প্রয়োজনীয়তা উড়িয়ে দেন। মূসা আলাইহিস সালামের গোটা শরীয়ত এবং নবীদের সকল শিক্ষার বিরোধিতা করে পল গালাতীয়দেরকে বলেন,

(ক) "দেখো, আমি পল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা (শরীয়ত পালনার্থে) ত্বক্‌ছেদ (খাতনা) প্রাপ্ত হও, তবে খ্রিস্ট হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না। যেকোনো মনুষ্য ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আমি পুনরায় এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, সে ঋণশোধের ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিতে বাধ্য। তোমরা যে সকল লোক ব্যবস্থা দ্বারা ধার্মিক গণিত হইতে যত্ন করিতেছ, তোমরা খ্রিস্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ, তোমরা অনুগ্রহ হইতে পতিত হইয়াছ।" (গালাতীয় ৫:২-৪)[৫৩]

(খ) তিনি অন্যত্র বলেন, "সেই কুকুরদের হইতে সাবধান, সেই দুষ্ট কার্যকারীদের হইতে সাবধান, সেই ছিন্ন লোকদের হইতে সাবধান। আমরাই ত ছিন্নত্বক্ লোক, আমরা যাহারা ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি এবং খ্রিস্ট যিশুতে শ্লাঘা করি, মাংসে প্রত্যয় করি না।" (পবিত্র বাইবেল : ফিলিপীয় ৩:২-৩)[৫৪]

(গ) "ওই কুকুরগুলো থেকে, অর্থাৎ যারা খারাপ কাজ করে এবং শরীরের কাটাছেঁড়া করাবার ওপর জোর দেয় তাদের থেকে সাবধান! আমরাই সত্যিকারের খাতনা করানো লোক, কারণ আল্লাহ্‌র রূহের সাহায্যে তাঁর ইবাদত করি এবং মসীহ ঈসাকে নিয়ে গর্ববোধ করি, আর বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ওপর ভরসা করি না।" (কিতাবুল মোকাদ্দস : ফিলিপীয় ৩:২-৩)

(ঘ) তীতকে লেখা পত্রে তিনি বলেন, "কারণ অনেক অদম্য লোক, অসার বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক লোক আছে, বিশেষত ত্বক্‌ছেদীদের মধ্যে আছে; তাহাদের মুখ বন্ধ করা চাই।" (পবিত্র বাইবেল : তীত ১:১০)[৫৫]

(ঙ) "এমন অনেক লোক আছে, যারা অবাধ্য, যারা বাজে কথা বলে ও যারা ছলনা করে বেড়ায়। যারা খাতনা করানোর ওপর জোর দেয়, বিশেষ করে আমি তাদের কথাই বলছি।" (কিতাবুল মোকাদ্দস : তীত ১:১০)

এভাবে পল খ্রিস্টধর্মকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া আদর্শ ও হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যার কারণে একদিকে ত্রিত্ববাদ দ্বারা খ্রিস্টধর্ম মূল তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে, সেই সাথে নবীগণের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে মনগড়া এক শিরকী ও কুফরী মতবাদে পরিণত

হয়েছে।

---

১ . Despite the proliferation of Bible translations, the King James Version is the top choice -and by a wide margin- of Bible readers. (Joe Carter, "Report: The Bible in American Life," Accessed 5/7/2018. https://www.thegospelcoalition.org/article/report-the-bible-in-american-life/)

২. এ মর্মে প্রসিদ্ধ বাইবেলে রয়েছে, "ইউসুফ নামে লেবির বংশের একজন লোক ছিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপে তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁকে সাহাবীরা বার্নাবাস অর্থাৎ উৎসাহদাতা (বা উপদেশের পুত্র) বলে ডাকতেন। তাঁর এক খণ্ড জমি ছিল, তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে সাহাবীদের পায়ের কাছে রাখলেন।" (প্রেরিত ৪:৩৬-৩৭)

৩. সেন্ট পল নিজেই বলেন, "আমি প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পথের (যিশুর পথে যারা চলত) প্রতি উপদ্রব করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতাম।' (প্রেরিত ২২:৪)

৪. কিন্তু বার্নাবাস তাঁকে সঙ্গে করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জানালেন, দামেস্কের পথে শৌল কিভাবে হযরত ঈসাকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং ঈসা কিভাবে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আর দামেস্কে ঈসার সম্বন্ধে কিভাবে তিনি সাহসের সঙ্গে তাবলীগ করেছিলেন। (প্রেরিত ৯ : ২৬-২৭)

৫. "আর বার্নবা ও শৌল (পল) আপনাদের পরিচর্যা কার্য সম্পন্ন করিবার পর যিরূশালেম হইতে প্রত্যাগমন করিলেন; যোহন যাহাকে মার্কও বলে, তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন।' (প্রেরিত ১২:২৫)

৬. উল্লেখ্য, লুক ছিলেন সেন্ট পলের শিষ্য। কাজেই গুরুর অপরাধ ঢাকতে খুব সম্ভব এখানে ঘটনার কারণ বর্ণনায় কোনো 'ত্রুটি' রয়েছে!)

৭. (Wherry, Rev. E.M. : A Comprehensive Commentary on the Quran: Comprising Sale's Translation and Preliminary Discourse (London, 1896)

৮. পরবর্তী সময়ে তাঁর বিভিন্ন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায়ও কবি আফজাল চৌধুরী ইংরেজি থেকে এর বাংলা অনুবাদ করেছেন, যা বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রকাশ করেছে। বার্নাবাসের বাইবেলে সেন্ট পলের বিভ্রান্তি প্রকাশের সাথে সাথে আখেরী নবী মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম সহকারে যিশুর ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত হয়েছে।

9. প্রেরিত ২১:৩৯, Paul said, "I am a Jew from Tarsus, in Cilicia (Acts 21:39; New King James Version (NKJV), প্রেরিত ২২:৩, "I am indeed a Jew, born in Tarsus of Cilicia." (Acts 22:3; NKJV)

10. প্রেরিত ২২:২৭-২৮,২৭ Then the commander came and said to him, "Tell me, are you a Roman?" He said, "Yes." 28 The commander answered, "With a large sum I obtained this citizenship." And Paul said, "But I was born a citizen." (Acts 22:27-28; NKJV), রোমীয় ১১:১-২, প্রেরিত ২২:৩, "I am indeed a Jew." (Acts 22:3; NKJV)

11. I am indeed a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city at the feet of Gamaliel, taught according to the strictness of our fathers' law, and was zealous toward God as you all are today. (Acts 22:3; NKJV)

12 Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews; concerning the law, a Pharisee. (Philippians 3:5; NKJV)

13. 4 My manner of life from my youth, which was spent from the beginning among my own nation at Jerusalem, all the Jews know. 5 They knew me from the first, if they were willing to testify, that according to the strictest sect of our religion I lived a Pharisee. (Acts 26:4-5; NKJV)

14. I persecuted this Way to the death, binding and delivering into prisons both men and women (Acts 22:4; NKJV)

15. And I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme; and being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities. (Acts 26:11; NKJV)

16. "Indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. 10 This I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I cast my vote against them." (Acts 26:9-10; NKJV)

17. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. (Galatians 1:13; NKJV)

18. "That you may eat and drink at My table in My kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel." (Luke 22:30; NKJV)

19. 27 Then Peter answered and said to Him, "See, we have left all and followed You. Therefore what shall we have?" 28 So Jesus said to them, "Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. (Matthew 19:27-28; NKJV)

20. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother,2 To the saints and faithful brethren in Christ who are in Colosse : (Colossians 1:1-2; NKJV)

21. 12 "While thus occupied, as I journeyed to Damascus with authority and commission from the chief priests, 13 at midday, O king, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me. 14 And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, 'Saul, Saul, why are you persecuting Me? It is hard for you to kick against the goads.' 15 So I said, 'Who are You, Lord?' And

He said, 'I am Jesus, whom you are persecuting. 16 But rise and stand on your feet; for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. 17 I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles, to whom I now send you, 18 to open their eyes, in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in Me.' (Acts 26:12-18; NKJV)

22. 9 Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision, "Do not be afraid, but speak, and do not keep silent; 10 for I am with you, and no one will attack you to hurt you; for I have many people in this city." 11 And he continued there a year and six months, teaching the word of God among them. (Acts 18:9-11; NKJV)

23. 17 "Now it happened, when I returned to Jerusalem and was praying in the temple, that I was in a trance 18 and saw Him saying to me, 'Make haste and get out of Jerusalem quickly, for they will not receive your testimony concerning Me.' (Acts 22:17-18; NKJV)

24. But the following night the Lord stood by him and said, "Be of good cheer, Paul; for as you have testified for Me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome." (Acts 23:11; NKJV)

25 Paul, an apostle not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. (Galatians 1:1; NKJV)

26. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through His grace. (Galatians 1:15; NKJV)

27. 5 For I consider that I am not at all inferior to the most eminent apostles. 6 Even though I am untrained in speech, yet I am not in knowledge. But we have been thoroughly manifested among you in all things. (2 Corinthians 11:5-6; NKJV)

28. 7 But on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised had been committed to me, as the gospel for the circumcised was to Peter 8 (for He who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles). (Galatians 2:7-8; NKJV)

29. Then He said to me, 'Depart, for I will send you far from here to the Gentiles.'" (Acts 22:21; NKJV)

30. 1 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for you Gentiles-2 if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you. (Ephesians 3:1-2; NKJV)

31. But the Lord said to him, "Go, for he is a chosen vessel of Mine to bear My name before Gentiles, kings, and the children of Israel. (Acts 9:15; NKJV)

32. 26 And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples; but they were all afraid of him, and did not believe that he was a disciple. 27 But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that He had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. 28 So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. (Acts 9:26-28; NKJV)

33. 16 to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia, and returned again to Damascus. 18 Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and remained with him fifteen days. 19 But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. (Galatians 1:16-19; NKJV)

34. গালাতীয় ১:১৬-১৭, 16 to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia, and returned again to Damascus. (Galatians 1:16-17; NKJV)

35. গালাতীয় ১:৮, But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. (Galatians 1:8; NKJV)

36. For if the truth of God has increased through my lie to His glory, why am I also still judged as a sinner? (Romans 3:7; NKJV)

37.পেগ্রিত ২৬:১৭, I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles, to whom I now send you. (Acts 26:17; NKJV)

38. Nero condemned Paul to death by decapitation. (M.R. James, "The Acts of Paul", in The Apocryphal New Testament, (Oxford, Clarendon Press, 1924))

39. And the men who journeyed with him stood speechless,

hearing a voice but seeing no one. (Acts 9:7; NKJV)

40. And those who were with me indeed saw the light and were afraid, but they did not hear the voice of Him who spoke to me. (Acts 22:9; NKJV)

41. And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, 'Saul, Saul, why are you persecuting Me? It is hard for you to kick against the goads.' (Acts 26:14; NKJV)

42. 11 But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. 12 For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. 13 For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. 14 And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. 15 But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through His grace, 16 to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia, and returned again to Damascus. (Galatians 1:11-17; NKJV)

43. Dr. Arnold Meyer, Jesus or Paul?, (London, Harper & Brothers, 1909), 122.

44. Johannes Lehmann, The Jesus Report. Translated by Michael Heron (London, Souvenir Press, 1971), 126.

45. 1 Then after fourteen years I went up again to Jerusalem with Barnabas, and also took Titus with me. 2 And I went up by revelation, and communicated to them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to those who were of reputation, lest by any means I might run, or had run, in vain. (Galatians 2:1-2; NKJV)

46. Because the law brings about wrath; for where there is no law there is no transgression. (Romans 4:15; NKJV)

47. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. (Romans 6:14; NKJV)

48. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life. (2 Corinthians 3:6; NKJV)

49. Knowing that a man is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law; for by the works of the law no flesh shall be justified. (Galatians 2:16; NKJV)

50. Knowing this: that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, 10 for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine. (1 Timothy 1:9; NKJV)

51. Yet the law is not of faith (Galatians 3:12; NKJV)

52. 17 "Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill. 18 For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. 19 Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. 20 For I say to you, that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. (Matthew 5:17-20; NKJV)

53. 2 Indeed I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. 3 And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. 4 You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law; you have fallen from grace. (Galatians 5:2-4;NKJV)

54. 2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation! 3 For we are the circumcision, who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. (Philippians 3:2-3;NKJV)

55. 10 For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision, 11 whose mouths must be stopped. (Titus 1:10-11;NKJV)

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :

মাওলানা মাহমুদুল হাসান

রাসূলুল্লাহ (সা.) উজ্জ্বল প্রভাতে ফজর নামায পড়তেন

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

সব ইমামের ঐকমত্যে সুবহে সাদিক তথা প্রভাতের প্রারম্ভ থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজর নামাযের ওয়াক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক নামায উত্তম ওয়াক্তে আদায় করতেন। তাই ফজরের নামাযও উত্তম ওয়াক্ত তথা উজ্জ্বল প্রভাতে আরম্ভকরত সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে সমাপ্ত করতেন এবং সাহাবাগণকেও এমন করতে উৎসাহ দিতেন। হযরত রাফে বিন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত–

قال سمعت رسول الله يقول: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"

"আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা ফজর নামাযের বেলায় ফর্সা হওয়ার অপেক্ষা করো। কেননা ফজর নামায উজ্জ্বল প্রভাতে আদায় করাতে অনেক বেশি প্রতিদান।" (আবু দাউদ : ১/৬১, হা: ৪২৪ তিরমিযী : ১/৪০, হা: ১৫৪ নাসাঈ : ১/৯৪, হা : ৫৪৯ ইবনে মাজাহ : ১/৪৯, হা : ৬৭২, আহমদ : ৪/১৪৩, হা : ১৭২৮৬, হাদীস সহীহ।)

এ হাদীসটি অনেক সূত্রে বিভিন্ন ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে আরো একটি বর্ণনায় আছে–

عن النبى قال :أصبحوا بالصبح فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم

"রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ফজরের নামায খুব প্রভাত হলে পড়ো। কেননা যখনই তোমরা খুব প্রভাত হওয়ার পর ফজর পড়বে, অধিক বিনিময় লাভ করবে।" (সহীহ ইবনে হিব্বান : ৪/৩৫৫, হা : ১৪৮৯, হাদীস সহীহ।)

ফজর নামাযের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্ত হাদীস অপেক্ষা এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। আহলে হাদীস মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক নাসিরউদ্দীন আলবানীও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (ইরওয়াউল গালীল : ১/২৮১, হা : ২৫৮) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) এই হাদীসটিকে মুতাওয়াতির তথা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। (ক্বাতফুল আযহার, পৃ : ৭৮)

হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত–

ثم أمره الغد فنور بالصبح

পরের দিন বেলাল (রা.)-কে ফজরের আযান দিতে বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই আলোকিত প্রভাতে ফজর আদায় করেন। (সহীহ মুসলিম : ১/২২৩, হা : ৬১৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত–

قال :ما رأيت النبى صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها-

তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উত্তম ওয়াক্ত ব্যতীত কোনো নামাযই পড়তে দেখিনি। শুধু দুই ওয়াক্ত নামাযই তিনি মুযদালিফায় উত্তম ওয়াক্ত ব্যতীত পড়েছেন, তখন মাগরিবের নামায এশার ওয়াক্তে একত্রে পড়েছেন। আর সেদিন ফজর নামায পড়েছেন তাঁর নিয়মিত ওয়াক্তের পূর্বে ভোর অন্ধকারে।" (সহীহ বোখারী : ১/২২৮, হা : ১৬৮২, সহীহ মুসলিম : ১/৪১৭, হা : ১২৮৯)

হাফেজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রহ.). (ফাতহুল বারী, ৩/৬২০) এবং আহলে হাদীস দলের প্রখ্যাত ইমাম শাওকানী (নাইলুল আওতার, ২/২১) উল্লেখ করেন যে এ হাদীসে قبل ميقاتها তথা নিয়মিত ওয়াক্তের পূর্বে বলে বোঝানো হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু সেদিনই ফজর নামায উজ্জ্বল প্রভাতে না পড়ে ভোর অন্ধকারে পড়েছেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ধারাবাহিক নিয়ম ছিল ফজর নামায উজ্জ্বল প্রভাতে আদায় করা।

অতএব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুকরণ হিসেবে ফজর নামায ভোর অন্ধকারে না পড়ে উজ্জ্বল প্রভাতে পড়াই উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর পরবর্তী যুগেও এ ধারাবাহিকতা চলে আসছে। প্রখ্যাত তাবই ইব্রাহিম নাখয়ী (রহ.) বলেন, উজ্জ্বল প্রভাতে ফজর নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সাহাবাগণের যে ইজমা (ঐকমত্য) লক্ষ করা যায়, এর বিপরীত তা লক্ষ করা যায় না। (আল্লামা যায়লায়ী (রহ) নাছবুর রায়াতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। ১/২৩৯, অনুরূপ ত্বহাবী, ১/১৮৪ হা : ১০১৩)

উপরোক্ত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়মিত আমল ছিল উজ্জ্বল প্রভাতে ফজর নামায আদায় করা। এমনকি মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে এমন ফর্সা অবস্থায় নামায সমাপ্ত করতেন যে, কোনো কোনো সাহাবী বলতেন : قد طلعت الشمس মনে হয় সূর্যোদয় হয়ে গেছে। (সহীহ মুসলিম : ১/২২৩, হা : ৬১৪)

বিশেষ করে প্রথম হাদীসে فإنه

أعظم للأجر উজ্জ্বল প্রভাতে নামায পড়লে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিদান বলে মহানবী (সা.) অন্যদেরও উজ্জ্বল প্রভাতে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ দেন। বিধায় ফজরের নামায ভোর অন্ধকার সময়ে না পড়ে উজ্জ্বল প্রভাতে পড়াই উত্তম।

কিন্তু সম্প্রতি কতিপয় লোক সর্বাপেক্ষা সহীহ হাদীসগুলো উপেক্ষা করত ভোর অন্ধকারে নামায পড়ার কথা বলে বেশি প্রতিদান ও সর্বাপেক্ষা সহীহ সনদে বর্ণিত রাসূলের উত্তম কাজ তথা সুন্নাতে রাসূল থেকে সরলমনা মুসলমানদের বঞ্চিত করার পাঁয়তারা করে যাচ্ছে। এ দেশের মুসলমানদের দীর্ঘকালের সুদৃঢ় ঐক্যের ভীত ভঙ্গ করার দুরভিসন্ধিতে কোরআন-হাদীসে নানা ধরনের সংশয় সৃষ্টি করে যাচেছ। এভাবেই উপরোল্লিখিত মাসআলায়ও তারা বিভিন্ন সংশয় উল্লেখ করে থাকে। যেমন–

সংশয় : ১

তারা মনে করে যে ফজরের নামায ভোর অন্ধকারে পড়তে হবে, এ ব্যাপারে তারা কিছু হাদীস পেশ করে, যাতে অন্ধকারে নামায পড়ার কথা রয়েছে বলে তারা মনে করে। এ ধরনের একটি হাদীস নিম্নরূপ–

عن عائشة (رضـ) قالت :لقد كان نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول اللّٰه متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس.

"হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। উম্মাহাতুল মুমিনীনগণ চাদর আবৃতাবস্থায় ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহর (সা.) সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। অতঃপর ঘরে প্রত্যাবর্তনকালে অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না।" (সহীহ মুসলিম : ১/২৩০, হা : ৬৪৫)

নিরসন : উল্লিখিত হাদীস এবং এ ধরনের যে সমস্ত হাদীসে غلس তথা অন্ধকারহেতু উম্মাহাতুল মুমিনীনদেরকে চেনা যেত না বলে উল্লেখ রয়েছে তা রাসূল (সা.)-এর বাণী নয়। বরং বর্ণনাকারী মনে করেছেন যে চেনা না যাওয়ার কারণ হয়তো অন্ধকারই হবে। তাই তিনি নিজের পক্ষ থেকে غلس অন্ধকার শব্দটি সংযোজন করেছেন। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা ইবনে মাজায় উল্লেখ রয়েছে। এতে রয়েছে تعنى من الغلس অর্থাৎ তাঁদের চেনা না যাওয়ার একটি সম্ভাব্য কারণ বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন। আর তা হলো : "অন্ধকার"। (ইবনে মাজাহ : ১/৪৯ হা : ৬৬৯ সনদটি সহীহ।)

সত্যিকারার্থে তাঁদের না চেনা যাওয়ার কারণ অন্ধকার নয়; বরং তাঁরা পর্দাবৃত থাকার কারণে তাঁদের চেনা যেত না, যা হাদীসেই উল্লেখ রয়েছে متلففات بمروطهن "তারা পর্দা আবৃতাবস্থায় ছিলেন"। তাই ইমাম বোখারী এ হাদীস বর্ণনাকালে غلس বা অন্ধকারের কারণে চেনা যায়নি বাক্যটি উল্লেখ করেননি। (সহীহ বোখারী : ১/৫৪, হা : ৩৭২) অতএব ফজর নামায অন্ধকারে পড়ার কথাটি এই হাদীসে উল্লেখ নেই। আর তর্কের খাতিরে যদি মানাও হয় যে অন্ধকারে নামায পড়ার বাক্যটি রাসূল (সা.)-এর হাদীসের অংশ, এমতাবস্থায় আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.)-এর সমাধানে লিখেছেন যে এ অন্ধকার রাতের অন্ধকার নয় বরং মসজিদের ছাদের অন্ধকার ছিল। আর উম্মাহাতুল মুমিনীনদের বাসাও মসজিদের ভেতরেই ছিল। তাই তাঁদের চলার পথে এ সময় অন্ধকার মনে হতো। অথচ বাইরে তখন ফর্সা ছিল। (ফাতহুল ক্বাদীর : ১/১৯৯)

সংশয় : ২

তাদের আরো একটি সংশয় হিসেবে আবু দাউদ থেকে উসামা বিন যায়েদ আল লাইছী থেকে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশ পেশ করে থাকে–

...صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر.

"রাসূলুল্লাহ (সা.) একসময় ফজর নামায ভোর অন্ধকারে পড়েন। অতঃপর উজ্জ্বল প্রভাতে পড়েন। অতঃপর ওফাত পর্যন্ত ভোর অন্ধকারে পড়েন। আর কখনো উজ্জ্বল প্রভাতে পড়েননি। (আবু দাউদ : ১/৫৭, হা : ৩৯৪, হাদীস হাসান লি-যাতিহি)

নিরসন : এ হাদীসে যদিও অন্ধকারে ফজর নামায পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু ইমাম আবু দাউদ নিজেই এ হাদীসটি বর্ণনাকরত এতে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন। এ হাদীসে এক বর্ণনাকারী রয়েছে উসামা আল লাইছী। ইমাম আবু হাতেম রাযী বলেন, তার হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য নয়। (আল জারহু ওয়াত্ তাদীল : ২/২৮৫) বিশেষ করে যখন এমন ব্যক্তির হাদীস কোনো বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধ হবে তখন তো গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। অথচ এ হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধ উজ্জ্বল ফর্সায় নামায পড়ার উৎসাহমূলক বোখারী মুসলিমে বর্ণিত সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হাদীস ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ভোর অন্ধকারে নামায পড়ার এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্য ইমাম বোখারী ও মুসলিম উপরোল্লিখিত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ফজরের নামায অন্ধকারে পড়ার এ অংশটুকু বর্জন করেছেন। তাই মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে এ অংশটুকু মেনে নিলেও উজ্জ্বল প্রভাতে নামায পড়ার অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা এ অশংটুকু রহিত গণ্য হবে। আর পূর্বোল্লিখিত হাদীসের আলোকে উজ্জল প্রভাতে ফজর নামায আদায় করাই মহানবী (সা.)-এর সুন্নাত হিসেবে প্রমাণিত হবে। (বাজলুল মাজহুদ : ৩/২২২)

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৬

মুফতী শরীফুল আজম

বয়ানের মূলনীতি

দাওয়াতের মেহনত মূলত মাগীবাত তথা অদৃশ্য বাস্তবের ওপর ইয়াক্বীন বাড়ানো এবং মুশাহাদাত তথা দৃশ্যমান বস্তুর ওপর থেকে ইয়াক্বীন হটানোর মেহনত। দিলের ইয়াক্বীন ঠিক করতে হলে মাখলুক থেকে হওয়ার বিশ্বাস পরিহার করে খালেক থেকে হওয়ার বিশ্বাস জমাতে হবে। দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিটি আমল ও কর্মসূচি এ মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাবলীগী বয়ানের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। যার ফলে বক্তার নাম ঘোষণা করে স্টেজে আহ্বান করার রেওয়াজ মোবারক এ মেহনতের মাঝে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। কে বলছে তা এখানে দেখার বিষয় নয় বরং কী বলছে সেটাই লক্ষণীয়। বক্তার প্রতি শ্রোতার আসক্তি একটি স্বভাবজাত বিষয়। কিন্তু এটাও এক প্রকার মাখলুকের মুহাব্বত। তাই দাওয়াতের মেহনতে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

শ্রোতার জন্য খতরা :

টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমায় আজ পর্যন্ত কোনো মুরব্বির নাম ঘোষণা করা হয়নি। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তবে তা হবে দুঃখজনক। আমাদের দেশের কিছু মুবাল্লিগ ভাইয়েরা দুর্ভাগ্যবশত এই ফেতনার শিকার হয়ে পড়েছে। বিশ্ব ইজতিমায় নিজের পছন্দের মুরব্বির বয়ান শুধু গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়, অন্যদেরটা অত গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটা এক ধরনের ভাইরাসে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্ধ ভক্তি এত প্রগাঢ় রূপ ধারণ করেছে যে মেহনতের চেয়ে ব্যক্তির মর্যাদা বড় করে দেখা হচ্ছে। খালেকের দাওয়াত ছেড়ে মাখলুকের দাওয়াতে জান, মাল এবং সময় ব্যয় করা হচ্ছে।

বিশ্ব ইজতিমায় বড়দের বয়ান সাধারণত উর্দূ ভাষায় হয়ে থাকে। দোভাষীর মাধ্যমে সাধারণ মুবাল্লিগ ভাইয়েরা তা বুঝে থাকেন। কোনো মুরব্বির বয়ানে কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলে তা ওই দোভাষীর মধ্যস্থতায় হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, দোভাষী যদি বলে, বয়ানে কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে, পূর্ববর্তী হযরতজিগণের কর্মপন্থার বিপরীত কথা বলা হচ্ছে। অতএব সকলে সতর্ক হোন। কোনো কোনো শ্রোতা তখন আর দোভাষীকে বিশ্বাস করতে পারে না। এটাকেই বলে অন্ধ ভক্তি। যে দোভাষী দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে সারাটি জীবন উৎসর্গ করে দিলেন। বিশ্ব ইজতিমায় যাঁর অনুবাদ সর্বাধিক সুনাম কুড়িয়েছে। দীর্ঘ বয়ানের অনুবাদ হুবহু তুলে ধরার ব্যাপারে যাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ও যশ জনশ্রুত রয়েছে, সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য–এমন দোভাষী মুবাল্লিগ আজ মাখলুকের মুহাব্বতের বলি হতে চলছে। এটা তাবলীগী বয়ানের মূলনীতির সাথে কিছুতেই খাপ খায় না।

বিশ্ব ইজতিমা চলাকালীন যে মাশওয়ারা হয় তাতে অংশ নিয়ে যখন জিম্মাদার সাথীরা নিজ খেত্তায় ফিরে আসে তখন তারাই প্রচার করে বেড়ায় আজ অমুক মুরব্বি বয়ান করবেন। এতে সাধারণ সাথীরা ধীরে ধীরে ওই মুরব্বিকে গুরুত্ব দিতে শেখে। ফলে একসময় তাঁর অন্ধ ভক্তে পরিণত হয়। এভাবে খালেকের পরিবর্তে মাখলুকের সন্তুষ্টি অর্জনের পেছনে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। এর দায়-দায়িত্ব ওই মাশওয়ারার জিম্মাদার সাথীগণ এড়াতে পারবে না। আগামীতে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

বয়ানকারীর জন্য খতরা :

এই মেহনতের মাঝে যারা ভালো বয়ানী, বেশি বেশি বয়ান করবে এবং তাদের বয়ানে আকর্ষণ সৃষ্টি হবে তাদের জন্য বড় ভয় রয়েছে। হুব্বে যাহ, আর হুবেব মালের ফেতনা তাদের গ্রাস করবে। অহংকার আর আত্মম্ভরিতা তাদের পিছু ছাড়বে না। এমনকি তারা একসময় ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারে দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হতে পারে। এ ব্যাপারে মুবাল্লিগে আজম হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খান (রহ.) বলেন,

اس کام میں سب سے بڑا خطرہ بیان کرنے والوں پر ہے، یا تو وہ اپنے بیانات اصول سے ہٹا دیتے ہیں کسی پر رد کسی پر ضرب کسی پر اعتراض کسی کی تنقیص یا بیانات میں تواضع کی بجائے کبر کی شان پیدا ہوجاتی ہے، یہ بھی ہمارے لئے بہت خطرہ کی چیز ہے۔ طریقہ بیان خوشآمدانہ جیسے چھوٹا بڑوں سے کوئی بات کہہ رہا ہو (ایک قیمتی مشورہ ص ۲۵)

এই মেহনতে বয়ানকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় শঙ্কা রয়েছে। হয়তো তারা বয়ানে উসূল ভঙ্গ করে, নচেৎ কারো কথার জবাব দেয় বা সমালোচনা করে বসে। অন্যের ওপর আপত্তি বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। অথবা বয়ানের মাঝে বিনয়ের পরিবর্তে অহংকারী ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। এগুলো আমাদের জন্য অনেক ভয়ের কথা। বয়ানের ধরন খোশামোদ-তোশামোদের মতো হওয়া চাই। যেন ছোট বড়দের সাথে কোনো কথা বলছে।

বয়ানের ১০ আদব :

হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) বয়ানসংক্রান্ত ১০টি হেদায়াত প্রদান করেছেন :

১. ছয় নম্বরের বাইরে কোনো কথা না বলা, ছয় নম্বরের ভেতর বয়ান সীমাবদ্ধ রাখা।

২. সাদামাটা ভাষায় সহজ কথা বলা; যেন উপস্থিত সকল স্তরের লোকজন বুঝতে পারে।

৩. তাহকীক ছাড়া কোনো কথা না বলা।

৪. দ্বীনের ওপর চলার লাভ খুব বেশি করে বয়ান করা এবং সুসংবাদ শোনানো, আযাব বা ধমকির কথা না শোনানো।

৫. বয়ানে কোরআন-হাদীসের কথা বলা, খুব বেশি হলে ইসলামের ইতিহাসও বলা যেতে পারে।

৬. বয়ানে শোনা কথা না বলা। তদ্রূপ সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা না করা।

৭. কোনো ব্যক্তি বা দলের সমালোচনা না করা।

৮. একরাম ও এখলাসের অনুশীলন হতে হবে। নসীহতকারী বা উপদেশদাতা হিসেবে কথা না বলা।

৯. দাওয়াতের মেহনত বোঝাতে হবে, নিজের ব্যক্তিত্ব ফোটানো যাবে না।

১০. আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) এবং সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) প্রতি আল্লাহর যে সাহায্য হয়েছে, সেগুলো বয়ান করা। নিজেদের প্রতি যে সাহায্য এসেছে তা বয়ান না করা। (সাওয়ানেহে মাওলানা এনামুল হাসান-১/৩০১)

এ ছাড়া হযরতজি (রহ.) লম্বা বয়ান ও সাহিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতে বারণ করতেন।

تبلیغ کے ادب میں سے یہ ہے کہ بات بہت لمبی نہ ہو اور شروع میں لوگوں سے صرف اتنا عمل کا مطالبہ کیا جائے جس کو بہت مشکل اور بڑا بوجھ نہ سمجھے کبھی کبھی لمبی بات اور لمبا مطالبہ لوگوں کے اعراض کا باعث بن جاتا ہے (ملفوظات ص ۱۳۷)

একবার একজন আলেমে দ্বীন হযরতজির কাছে দরখাস্ত করলেন যে, বয়ান যদি একটু বুঝমান লোকেরা করে তাহলে ভালো হয়। উত্তরে হযরতজি (রহ.) বলেন, আপনার কথায় মনে হচ্ছে ইসলামের মাঝে কোনো সৌন্দর্য নেই বরং অন্যের বাকপটুতা ও ভাষা-সাহিত্যের দ্বারা এর মাঝে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। যেন ফিরনির গুণ রুপার প্লেটের কারণে, মাটির প্লেটে ওই গুণ থাকে না। অথচ বাস্তব হচ্ছে ফিরনি যেকোনো পেয়ালা বা প্লেটে থাক সেটাকে শখ করে খাওয়া হয়। ঠিক তেমনি ইসলামও একটি শক্তি, যার দ্বারা অন্য ব্যক্তি বলীয়ান হয়। কিন্তু আজকাল বক্তারা শব্দের গাঁথুনিতে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। অথচ বাস্তব হচ্ছে ইসলাম এ ধরনের বানোয়াট থেকে পবিত্র, এর বিকাশ আত্মিকভাবে হয়ে থাকে। তাই হুজুর পাক (সা.) বা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে দীর্ঘ বক্তৃতার প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রতিটি শব্দ অন্তরে প্রভাব ফেলে। (সাওয়ানেহে মাওলানা এনামুল হাসান-১/৩০০)

নিয়ম ভেঙে বয়ান :

বর্তমান তাবলীগ জামা'আতের মাঝে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে লাগামহীন বয়ান। ছয় নম্বরের মাঝে বয়ান সীমাবদ্ধ থাকার নিয়ম ভেঙে বয়ানের মাঝে মাসআলা-মাসায়েল টেনে আনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের বিতর্ক। অথচ কথা ছিল মাসায়েলের বিষয় উলামায়ে কেরামের ওপর ছেড়ে দেওয়া। তিন হযরতজির আমল তা-ই ছিল। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) দেওবন্দের মুফতী কেফায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর কাছ থেকে মাসআলা জেনে সে মতে কাজ করতেন। অথচ তিনি নিজেও বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলেম ছিলেন। তা সত্ত্বেও মাসআলার ভার নিজে নিতেন না। পরবর্তী হযরতজিদেরও দেখা যায় এ নিয়ম অনুসারে দেওবন্দ ও সাহারানপুরের মুফতী হযরতদের কাছ থেকে মাসআলা জেনে আমল করতে। অতএব তাদের আমলে ফাযায়েলের মারকায ছিল নিযামুদ্দিন আর মাসায়েলের মারকায ছিল দেওবন্দ।

কিন্তু দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হয় যে পূর্ববর্তী হযরতজিগণের অনুসৃত এ পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মাওলানা সা'দ সাহেব। তিনি দেওবন্দকে এক প্রকার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। মুখে মুখে দেওবন্দের অনুসরণের কথা বলা হলেও কার্যত দেওবন্দের বিরোধিতাই ফুটে উঠছে। বিষয়টি সকলেই উপলব্ধি করছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কখনো সফল হয় না।

মাওলানা সা'দ সাহেব সকল ক্ষেত্রে নিযামুদ্দিনকে মারকায বানানোর নির্দেশ প্রদান করে চলছেন। কী ফাযায়েল, কী মাসায়েল সকল বিষয়ের দায়িত্ব তিনি নিজ স্কন্ধে নিতে অতি আগ্রহী। দেদার তিনি মাসআলা দিয়ে যাচ্ছেন। কেউ ভুল ধরিয়ে দিলেও তিনি গা করছেন না। উপরন্তু বিভিন্ন ভুল মাসআলা তিনি বড় মজমায় প্রদান করে থাকেন। বয়ানের মাঝে মাসআলার আলোচনা ইতিপূর্বে কোনো মুরব্বিকে করতে দেখা যায়নি।

কয়েকটি ভুল মাসআলা :

মাওলানা সা'দ সাহেব প্রদত্ত কয়েকটি ভুল মাসআলা তুলে ধরা হলো।

(ক) টঙ্গীর ইজতিমায় উলামাদের বয়ানে তিনি বলেন, নামাযের বাহির থেকে কেহ ইমামকে লোকমা দিলে তা গ্রহণ করা যায় না। বিধায় আলেমরা তাবলীগের কাজে ভুল ধরে দিলে তা মানা যাবে না। অথচ তাঁর মাসআলাটি পরিপূর্ণ সঠিক হয়নি।

এমন অনেক ভুল আছে, যে ব্যাপারে

নামাযের বাহির থেকে লোকমা দিলেও তা গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় নামায শুদ্ধ হবে না। যেমন–কোনো মুসাফির চিন্তা-ভাবনা করে কেবলার দিক স্থির করে নামায আরম্ভ করল। স্থানীয় এক লোক এসে দেখল লোকটি উত্তর দিকে ফিরে নামায পড়ছে। সাথে সাথে চিৎকার দিল এদিকে কেবলা নয়, আপনার ভুল হচ্ছে। এমতাবস্থায় তার লোকমা গ্রহণ জরুরি।

অথবা না জেনে কেহ নাপাক বিছানায় নামায আরম্ভ করল। ঘরের মহিলারা দেখে বলতে লাগল বিছানাটি নাপাক। তাদের এই লোকমা গ্রহণ আবশ্যক। অথবা না জেনে কেহ বদনায় থাকা নাপাক পানি দিয়ে ওজু করে নামাযে দাঁড়াল। পানির মালিক এসে বলল পানি অপবিত্র ছিল। এমতাবস্থায় তার লোকমা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। অন্যথায় নামায হবে না। অতএব তাবলীগের মুরব্বি ভুল মাসআলা বললে বা কোরআন-সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা দিলে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম লোকমা দিতে পারবেন। তাঁদের লোকমা গ্রহণ না করলে তাবলীগ হবে না।

(খ) মাওলানা সা'দ সাহেব বলেন, ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল পকেটে নিয়ে নামায পড়লে নামায হবে না, তোমরা যত ইচছা উলামাদের কাছ থেকে ফতওয়া নিতে পারো।

তাঁর এই মাসআলাও ভুল এবং মাসআলা প্রদানের আন্দাজও ভুল। শরীয়তের কোনো দলিল এর সপক্ষে পাওয়া যায় না।

(গ) তিনি বলেন, ক্যামেরাওয়ালা মোবাইলে দেখে দেখে কোরআন শোনা বা পড়া হারাম। কোরআন অবমাননার শামিল। এর ওপর কোনো সওয়াব পাবে না।

এই মাসআলার পক্ষেও কোনো দলিল তিনি পেশ করতে পারবেন না। এটা শুধুমাত্র নিজের মনের আবেগ থেকে বলা। শরীয়তের হুকুম-আহকাম নিয়ে এমন মন্তব্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

(ঘ) তাঁর মতে দাওয়াত ফরযে আইন। মসজিদে ঈমানের হালকা কায়েম করা ফরয। অথচ ফরয বা হারাম শরীয়তের একটি পরিভাষা, কোনো বিষয় ফরয বা হারাম সাব্যস্ত হতে হলে কোরআন-সুন্নাহর নির্দিষ্ট বিধান সর্বাধিক শক্তিশালী নস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রীয় ভাষায় যাকে قطعی الثبوت قطعی الدلالة বলা হয়। এমন দলিল ছাড়া কোনো বিষয়কে ফরয বা হারাম ঘোষণা করে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার বিধানে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। মাওলানা সা'দ সাহেব কথায় কথায় ফরয বা হারাম ফতওয়া প্রদানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দাওয়াতের গুরুত্ব অনেক, তবে কোনো জিনিসের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তাকে ফরযে আইন বানানো জরুরি নয়। ফরযে আইন হওয়ার দাবি ভিত্তিহীন। ইতিপূর্বে কোনো মুরব্বি এমন ফতওয়া দেননি। খোদ হযরতজি ইলিয়াছ (রহ.)ও এটাকে ফরযে আইন বলেননি।

আক্রমণাত্মক দাম্ভিকতাপূর্ণ বয়ান :

বয়ানের অন্যতম উসূল ছিল কারো সমালোচনা না করা, উপদেশমূলক কথা না বলা এবং নিজের বড়াই প্রকাশ না করা।

মাওলানা সা'দ সাহেব এ সকল নিয়ম অহরহ ভঙ্গ করে চলছেন। যে সকল আলেম তাঁর ভুল মাসআলা সমর্থন করেন না তিনি বয়ানের মাঝে তাঁদের কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। তাঁদেরকে উলামায়ে ছু এবং ইহুদী-নাসারা দ্বারা প্রভাবিত বলে গালি দিয়ে থাকেন।

মাওলানা সাহেবের অধিকাংশ বয়ানের মাঝে এমন সব কথা শোভা পায়,

غور سے سنو غور سے سنو، میری رائے میری رائے، میرے نزدیک یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، یہ دہریت ہے، وہ شرک ہے، یہ جہالت ہے، وہ دھوکہ ہے، یہ باطل ہے، وہ احمق ہے، یہ فرض، یہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، یہ یہودیت ہے، وہ شیطانیت ہے۔

মনোযোগ দিয়ে শোনো, আমার মতে এটা সহীহ, এটা ভুল, এটা গ্রহণযোগ্য মত, ওটা গ্রহণযোগ্য মত নয়, এটা শিরক, ওটা অজ্ঞতা, এটা ধোঁকা, সে আহমক, এটা ফরয, ওটা হারাম, এটা শিরক, এটা ইহুদীবাদ, এটা শয়তানি ইত্যাদি।

নিজের ভ্রান্তমত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কসম খেয়ে খেয়ে এসব বয়ান করে থাকেন। অনেক সময় মিম্বরে হাত চাপড়ে এমন ভঙ্গিতে বয়ান করেন, যাতে দাম্ভিকতার ভাব ফুটে ওঠে। এ সকল আচরণ বয়ানের উসূল ও আদবের সাথে মেলে না। পূর্বের কোনো মুরব্বিকে এভাবে নিজের মত প্রতিষ্ঠার বয়ান করতে দেখা যায়নি। এটা দাওয়াতের মুবারক মেহনতের জন্য আশনি সংকেত। মাওলানা সাহেব বয়ানের ভারসাম্য হারিয় ফেললেন কি না মুবাল্লিগ ভাইদের চিন্তা করে দেখা দরকার।

মওদুদীবাদের পথে মাওলানা সা'দ সাহেব :

ছয় সিফাত এবং পাঁচ কাজের গণ্ডিতে বেঁধে দেওয়া মেহনতকে মাওলানা সা'দ সাহেব ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে চাচ্ছেন। তাঁর বয়ান এখন আর ছয় সিফাতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিগত কয়েক বছর থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে তিনি সাথীদের কোরআন তরজমা পড়ার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। টঙ্গীর জোড় এবং ইজতিমা উভয় স্থানে এ ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে, এটা মুবাল্লিগ ভাইদের জন্য নতুন সবক। দাওয়াতের মেহনতের মাঝে এ ধরনের নতুন কিছু করা হবে খেয়ানত।

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) এ মেহনতের প্রতিটি কর্মসূচি সমকালীন উলামা-মাশায়েখের সম্মতি নিয়ে চালু করেছেন, ছয় সিফাতও তার অন্যতম। পরবর্তী হযরতজিদ্বয় ওই নকশার ওপর হুবহু চলার চেষ্টা করেছেন, যার অনুমোদন উলামায়ে কেরাম থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাই বর্তমান মুরব্বিদের জন্য নিজের পক্ষ থেকে ছয় নম্বরের মাঝে পরিবর্তন বা নতুন করে কোরআন তরজমার কর্মসূচি ঘোষণা মেহনতের মাঝে খেয়ানত হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ দেশে একদল ইংরেজি শিক্ষিত লোক কোরআন তরজমা পড়ে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা মওদুদীর দলে যোগ দিয়েছে। আরেক দল লোক বোখারী মুসলিমের তরজমা পড়ে গোমরাহ হয়েছে। এরা জাকির নায়েকের ভক্তে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানি যে আমাদের উলামায়ে দেওবন্দ তাবলীগের সাথীদের হাতে কোরআন তরজমা বা হাদীসের তরজমা না দিয়ে ফাযায়েলে আমাল তুলে দিয়ে অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ফাযায়েলে আমাল কিতাব পড়ে আজ পর্যন্ত কোনো লোক পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ হয়নি। বরং যারা এই কিতাবের সমালোচনা করে যঈফ আখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছে তারাই পথ হারিয়েছে। অতএব ফাযায়েলে আমাল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কোরআন-হাদীসের তরজমার দিকে সাথীদের মনোযোগী করার অর্থ হচ্ছে মওদুদীবাদের পথে পরিচালিত করা।

মিস্টার মওদুদী নিজে ইংরেজি অর্ধশিক্ষিত হয়ে পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তাফসীর করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। তার অনুসারীগণ সেগুলো পড়ে পড়ে গোমরাহ হয়েছে। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর দিকে আঙুল তোলা শিখেছে। সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা শিখেছে। উলামা-মাশায়েখের বিদ্বেষ অন্তরে ধারণ করেছে।

মওদুদী সাহেবের লেখা তাফহীমুল কোরআন জামায়াত-শিবিরের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একসময় ছিল তারা সেগুলো পড়ে মসজিদে এসে কোরআন তরজমা শোনাত, দরসে কোরআনের আয়োজন করত আর ইমাম সাহেবের সাথে তর্কে লিপ্ত হতো। তাদের আনাগোনা এখন খুব একটা চোখে পড়ে না।

মাওলানা সা'দ সাহেবের অনুসারীগণ এখন মসজিদে মুনতাখাব হাদীস পড়ে এর ব্যাখ্যা শোনায়। কিছুদিন পরে যখন তারা একটু একটু কোরআন তরজমা শিখে ফেলবে তখন মসজিদে দাঁড়িয়ে কোরআন তরজমা শুনিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানের দুঃসাহস দেখাবে। ইমাম সাহেবের সাথে তর্কে জড়াবে। ইতিমধ্যে তাঁর অনুসারীগণ যথেষ্ট উলামাবিদ্বেষী হিসেবে গড়ে উঠেছে। তাদের আচরণে শুভ কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মাওলানা সা'দ সাহেব এখন নির্ভরযোগ্য প্রচলিত কোরআন তরজমা পড়ার কথা বললেও হয়তো এতে তাঁর মন ভরবে না। একটা সময় আসবে নিজেই এমন কোরআন তরজমা প্রকাশ করবেন, যাতে দীর্ঘ দুই যুগ থেকে তিনি যে মতাদর্শ নিজের অনুসারীদের শিক্ষা দিয়ে মগজ ধোলাই করেছেন তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তরজমা ও টীকা উপস্থাপন করা হবে। তখন ওই বিশেষ তরজমা পড়তে সকলকে নির্দেশ দেওয়া হবে, নেসাব করে দেওয়া হবে। সেই দুর্দিন থেকে আল্লাহ তা'আলা উম্মতকে রক্ষা করুন।

না বুঝে কোরআন পড়া :

আমাদের দেশে যত প্রকার আহলে হাদীস আছে, জাকির নায়েকের ভক্ত আছে, মওদুদীপন্থী জামায়াত-শিবির আছে তাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে কোরআন শরীফ না বুঝে পড়লে কোনো সওয়াব হয় না। মাওলানা সা'দ সাহেব তাদের সাথে একমত পোষণ করেন বরং তিনি একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন,

ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے واجب، بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جو اس کو ترک کرے اس کو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔

অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর কোরআন বুঝে পড়া ওয়াজিব। না বুঝে কোরআন পড়লে কোনো ফায়দা হবে না। যে এটা ছেড়ে দেবে তার ওয়াজিব তরকের গোনাহ হবে।

কী চমৎকার ফতওয়া! যার পক্ষে কোনো দলিল দেওয়া সম্ভব হবে না। মনগড়া ব্যাখ্যা ছাড়া এ দাবি প্রমাণ করা যাবে না। হয়তো অনেকে এই ফতওয়া শুনে তেলাওয়াতই ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তেলাওয়াত করে অর্থ না বোঝার গোনাহগার হওয়ার চেয়ে তেলাওয়াত না করাই নিরাপদ।

দ্বীনের অপব্যাখ্যা :

বয়ানের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে তাহকীক ছাড়া কোনো কথা না বলা। মাওলানা সা'দ সাহেব দ্বীনের যে ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন থেকে তাঁর বয়ানের মাধ্যমে সাথীদের বুঝিয়ে আসছেন তাহকীক করে দেখলে তা ভুল প্রমাণিত হয়। একজন মুবাল্লিগ ভাই তাবলীগের কর্মসূচিগুলো পালন করলেই নিজেকে দ্বীনের ওপর আছেন ভাবতে থাকেন। অন্য সাথীরাও তা-ই মনে করেন। যেমন তিন চিল্লা, চিল্লা, নেসাব, মাসে তিন দিন, পাঁচ কাজ, সবগুজারী, পাহারাদারি, সিটি মাশওয়ারা, হালকার মাশওয়ারা, ত্রৈমাসিক জোড়, টঙ্গীর জোড়, বিদেশ সফর, নিযামুদ্দিনের তরতীবসহ যাবতীয় তাকাজা পুরা করা। এগুলো পালন করলেই পাক্কা সাথী মুবাল্লিগ হওয়া যায়। যদিও তার আকীদা খারাপ হয়,

আমল খারাপ হয়, ঘরে পর্দা নেই। মেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়ায়। প্রফেসর/শিক্ষক হয়ে বেপর্দা যুবতী মেয়েদের ক্লাস নেয়। সুদি ব্যাংকে চাকরি করে। চেম্বারে মহিলা সহকারী রেখে নির্জন সময় কাটায়। ব্যবসায় হারাম-হালালের তোয়াক্কা নেই। সুদি ঋণের আদান-প্রদান করে। বিবিকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে। অথচ এ সকল অপকর্ম ও বদদ্বীনি ঢাকা পড়ে যায় দাওয়াতের মেহনতের বদৌলতে। সমাজে তিনি পাক্কা দ্বীনদার। এটা কি বাস্তব দ্বীনের নমুনা হতে পারে?

পক্ষান্তরে কোনো মুবাল্লিগ ভাই যদি তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনের যে সামান্য ছোঁয়া পেয়েছে তাকে আরো মজবুত করার জন্য দ্বীনের পিপাসা নিয়ে আলেম-উলামাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। কোনো হক্বানী পীরের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে বলা হয়, আমাদের সাথী ছুটে গেছে। তাবলীগের কিছু কর্মসূচি পালন করলে সাথী ঠিকঠাক থাকে, দ্বীনদার থাকে আর এতে অবহেলা করলে দ্বীনের মাঝে ঘাটতি হচ্ছে মনে করা হয় কেন? দ্বীনের সংজ্ঞা বুঝতে ভুল হচ্ছে কি না ভেবে দেখতে হবে। এই ভুলের সূত্রপাত কোথেকে তা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হলে উম্মত পথভ্রষ্ট হবে। মওদুদীবাদের আদলে নতুন কোনো জামাআত গঠন হবে।

মাওলানা সা'দ সাহেবের মতে তাবলীগের ছয় সিফতের মেহনতই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। তিনি বলেন–

جوان چھ نمبروں کو پورا دین نہ سمجھے وہ اپنی ہی دہی کو کھٹا بتانے والا ہے ایسا آدمی کبھی تجارت نہیں کرسکتا۔

যে ব্যক্তি এই ছয় নম্বরকে পূর্ণ দ্বীন মনে করে না সে নিজের দধিকে নিজেই টক বলে বেড়ায়। এমন ব্যক্তি কখনো ব্যবসা করতে পারে না।

অথচ পূর্বের মুরব্বীগণ বলেগেছন, ছয় নম্বর পুরো দ্বীন নয় বরং পুরো দ্বীনের ওপর চলা সহজ করার একটি প্রাথমিক কোর্সমাত্র। আর মাওলানা সা'দ সাহেব এটাকে পূর্ণ দ্বীন আখ্যা দিয়ে দ্বীনের অপব্যাখ্যা করছেন।

মওদুদী সাহেবের মতে দ্বীন অর্থ রাষ্ট্র সরকার। (খুতবাত ৩২০) তিনি দ্বীনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে নামায, রোযা, হজ, যাকাতের মতো মৌলিক ইবাদতসমূহ গৌণ বিষয় আর হুকুমত প্রতিষ্ঠা মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মাওলানা সা'দ সাহেবের মতে নামায, রোযা, হজ, যাকাতের মতো ইসলামের মৌলিক ইবাদসমূহের চেয়ে দ্বীন জিন্দার মেহনত দাওয়াতে তাবলীগের গুরুত্ব বেশি। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা আর দ্বীন জিন্দা করা উভয়টা اعلاء كلمة الله এলায়ে কালিমাতুল্লাহর মর্মার্থ। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে মূল মাকসাদ মনে করা আর ইবাদতসমূহকে তার প্রস্তুতি মনে করা পাক্কা মওদুদীবাদ। মাওলানা সা'দ সাহেব দ্বীন জিন্দার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত আর খুরুজকে ইবাদতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে ভিন্ন ভাষায় অভিন্ন মত পোষণ করে চলছেন। মিস্টার মওদুদীর জন্মস্থান, তাঁর পড়ালেখা ও বেড়ে ওঠার তীর্থস্থান আওরঙ্গবাদ। কয়েক মাস পূর্বে মওদুদীর ঘাঁটি আওরঙ্গবাদের ইজতিমায় মাওলানা সা'দ সাহেব বলেন,

مغفرت اور مقبولیت کے لئے دیندار ہونا شرط نہیں، بلکہ اعانت دین شرط ہے۔

অর্থাৎ মাগফিরাত ও মকবুলিয়াতের জন্য দ্বীনদার হওয়া শর্ত নয় বরং দ্বীনের সাহায্য করা শর্ত।

এ কথার অর্থ কী দাঁড়ায়? এর অর্থ তো এটাই যে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে দ্বীনদারী এখতিয়ার করার চেয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জানমাল-সময় নিয়ে দ্বীনের সাহায্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার গুরুত্ব বেশি বরং মাগফিরাতের শর্ত।

দ্বীনের প্রকৃত সংজ্ঞা :

হযরত জিব্রাঈল (আ.) একবার নবীজি (সা.)-এর মজলিসে সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে মানুষ রূপে আগমন করেন এবং তিনটি সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে নবীজি (সা.)-এর সামনে দ্বীনের সংজ্ঞা তুলে ধরেন। এসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্রাঈল এখানে তুলে ধরা হলো।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকসমক্ষে ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাছে একজন লোক হাজির হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাঁর প্রেরিত রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং শেষ উত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তারপর আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী? রাসূল (সা.) বললেন, ইসলাম হলো আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা, ফরয নামায কায়েম করা, নির্ধারিত যাকাত আদায় করা এবং রমাযানের রোযা পালন করা। আগন্তুক আবার প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহসান কী? রাসূল (সা.) বললেন, ইহসান হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তাঁকে দেখেছ, যদি তুমি তাঁকে নাও দেখো, তাহলে (ভাববে যে) তিনি তো তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, কিয়ামত কখন হবে? রাসূল (সা.) বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে যাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি অধিক অবহিত নন। তবে হ্যাঁ, কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করছি, দাসী তার প্রভুকে জন্ম দেবে। এটি কিয়ামতের আলামতের

একটি। বিবস্ত্র দেহ, নগ্নপদ লোক হবে জনগণের নেতা, এটা কিয়ামতের আলামতের একটি। আর রাখালদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে, এটি সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। এ বলে রাসূল (সা.) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি নাযিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা রয়েছে মাতৃগর্ভে। আর কেউ জানে না কী উপার্জন করবে সে আগামীকাল এবং জানে না কেউ কোন মাটিতে সে মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা লুকমান-৩৪)

রাবী বলেন, অতঃপর লোকটি চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। তাঁরা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য গেলেন। কিন্তু কাউকে পেলেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইনি জিব্রাঈল (আ.)। লোকদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। (বোখারী শরীফ-১/৭৭)

এতে বোঝা গেল, ঈমান ও আমল তথা নামায, রোযা, হজ্জা, যাকাত এবং ইহসান তথা তাসাউফ এই সবের সমন্বয়ে দ্বীন হয়ে থাকে।

ইসলামে ইবাদতের স্থান :

ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত হলো মাকসাদ আর দাওয়াত জিম্মাদারি। ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দাওয়াতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি হলো মৌলিক ইবাদত এবং এগুলো দ্বীনের মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়। ঈমানের পর এগুলো দ্বীনের মুখ্য উদ্দেশ্য। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ :شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

অর্থাৎ পাঁচটি বিষয়ের ওপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। তা হলো, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমাযানের রোযা রাখা। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

পক্ষান্তরে মওদুদী সাহেবের মতে এ সকল ইবাদত ইসলামের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং এগুলো ট্রেনিং কোর্স। আর মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, বস্তুত ইসলামের নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতসমূহ এই উদ্দেশ্যের (জিহাদও ইসলামী হুকুমত) প্রস্তুতির জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (খুতবাত ৩১৫)

অন্যত্র তিনি বলেন,

یہ ہے اس عبادت کی حقیقت جسکے متعلق لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض نماز، روزہ اور تسبیح و تہلیل کا نام ہے، اور دنیا کے معاملات سے اسکو کچھ سروکار نہیں، حالانکہ دراصل صوم وصلوٰۃ اور حج وزکوٰۃ اور ذکر وتسبیح انسان کو اس بڑی عبادت کے لئے مستعد کرنے والی تمرینات (Training courses) ہیں (تفہیمات ج۱ص۷۹)

মূলত মানুষের রোযা, নামায, হজ, যাকাত, যিকির, তাসবীহ ওই বড় ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করার ট্রেনিং কোর্স। (তাফহীমাত-১/৬৯)

তার মতাদর্শ হচ্ছে ইবাদত মূল উদ্দেশ্য নয়, হুকুমত প্রতিষ্ঠা মূল উদ্দেশ্য। অথচ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে হুকুমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো নামায, যাকাত, আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠা করা। ইরশাদ হচ্ছে,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

অর্থাৎ আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার করবে। (সূরা হজ-২২/৪১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মূল উদ্দেশ্য হলো নামায, যাকাত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা আর রাষ্ট্র তার জন্য সহায়ক। অথচ মওদুদী সাহেব সম্পূর্ণ এর উল্টা বলেছেন যে মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আর নামায, রোযা হচ্ছে এর সহায়ক ও প্রস্তুতিস্বরূপ।

এবার দেখা যাক ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে মাওলানা সা'দ সাহেবের মূল্যায়ন।

ইবাদতের অবমূল্যায়ন :

মাওলানা সা'দ সাহেব বলেন,

اذان دعوت ہے، نماز تشکیل ہے اور نماز کے بعد اللہ کے راستہ کا خروج یہ ترتیب ہے۔

অর্থাৎ আযান হলো দাওয়াত, নামায হলো তাশকীল এবং নামাযের পর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া হচ্ছে তারতীব। মাওলানা সাহেবের মতে নামায হচ্ছে তাশকীল আসল মাকসাদ নয়। যেমন মওদুদী সাহেবের মতে নামায হচ্ছে ট্রেনিং বা প্রস্তুতি আসল উদ্দেশ্য নয়।

মাওলানা সা'দ সাহেব বলেন,

اس محنت میں مشورہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ عام ہے۔

অর্থ : এ মেহনতের মাঝে মাশওয়ারা নামাযের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং নামাযের চেয়ে ব্যাপক।

مومن جیسے نماز کا اہتمام کرتا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ مشورہ میں حاضر ہونے کا

اہتمام کرے۔۔۔۔۔۔

অর্থ : মুমিন যেভাবে নামাযের এহতেমাম করে এর চেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে মাশওয়ারায় উপস্থিত হওয়ার এহতেমাম করা।......

মাওলানা সাহেবের এ সকল বক্তব্যের সারকথা হলো, নামাযের চেয়ে দ্বীন জিন্দার মেহনতের গুরুত্ব বেশি। ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীর চেয়ে ইজতেমায়ী আমল তথা দাওয়াতের গুরুত্ব বেশি। এক বয়ানে তিনি ইসলামের অন্যতম মৌলিক ইবাদত রোযার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

نبی پاک ﷺ نے رمضان میں فرض روزوں کو توڑوایا ہے مگر نقل وحرکت میں کمی نہ آنے دی۔

অর্থ : নবীজি (সা.) রমাযানের ফরয রোযা ভাঙিয়েছেন কিন্তু নকল ও হরকতে কমি আসতে দেননি।

এখানেও তিনি ইবাদতের চেয়ে দাওয়াতের মেহনতের গুরুত্ব বেশি বুঝিয়েছেন। অথচ রোযা ভাঙার ঘটনাটি ছিল সফরের কারণে, কোনো মেহনতের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নয়।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : আমি মানব এবং জিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। (সূরায়ে যারিয়াত ৫৭)

এতে বোঝা যায়, মানুষের জিন্দেগীর মাকসাদ ইবাদত, দাওয়াত নয়। দাওয়াতের মেহনত হচ্ছে জিম্মাদারি। মাকসাদ আর জিম্মাদারি এক কথা নয়।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর সমালোচনা :

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো, আম্বিয়ায়ে কেরাম সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে ও গোনাহ থেকে পবিত্র।

والا نبياء عليهم الصلوٰة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح يعنى قبل النبوة و بعدها (شرح الفقه الاكبر لابى المنتهى ١٦)

পক্ষান্তরে মওদুদী সাহেবের মতে নবীদের দ্বারা ভুল-ত্রুটি ও পাপ সংঘটিত হতে পারে। সূরা হুদের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, বস্তুত নবীগণ মানুষই হয়ে থাকেন এবং কোনো মানুষই মুমিনের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মাপকাঠিতে সর্বদা অটল থাকতে সক্ষম হতে পারে না। প্রায়শই মানবীয় নাজুক মুহূর্তে নবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ মানুষও কিছুক্ষণের জন্য মানবিক দুর্বলতার সামনে পরাভূত হয়ে যান। নাউযুবিল্লাহ (তাফহীমুল কোরআন)

অতএব মওদুদী সাহেব কর্তৃক হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)সহ বিভিন্ন নবী-রাসূলের (আ.) সমালোচনা অতি প্রসিদ্ধ এবং নিন্দিত।

হযরত মাওলানা সা'দ সাহেবকেও তাঁর বিভিন্ন বয়ানে আম্বিয়া (আ.)-এর সমালোচনা করতে দেখা যায়। তিনি হযরত ইউছুফ (আ.) হযরত যাকারিয়া (আ.)সহ বিভিন্ন নবী-রাসূলের সমালোচনা করেছেন। সর্বশেষ তিনি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমালোচনা করে বলেছেন, নবীজি (সা.) হযরত যায়নব (রা.)-এর বিবাহে গুরুত্ব সহকারে গোশত-রুটি দিয়ে অলিমা করার কারণে কষ্ট পেতে হয়েছে। নবীজি (সা.)-এর অলিমা তো এমন হতো যে, খেজুর বণ্টন করে দিতেন বা খুরমা ছিটিয়ে দিতেন। নিজের এই নিয়ম ভেঙে বেশি গুরুত্ব দিয়ে অলিমা করার ফলে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। (আওরঙ্গবাদ ইজতিমা)

অথচ নবীজি (সা.)-এর সকল সুন্নাতই অনুসরণীয়। গোশত দিয়ে অলিমা করাও একটি সুন্নাত। নবীজি (সা.) নিজে তা করে দেখিয়েছেন এবং উম্মতদেরকেও এই হেদায়েত দিয়েছেন যে তোমরা অলিমা করো যদিও বকরি দ্বারা হয়।

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (صحيح البخاری رقم الحديث ٢٠٤٨)

তাসাউফ বা পীর-মুরীদির উপহাস :

হাদীসে জিব্রাঈলের ভাষ্য মতে দ্বীন তিনটি জিনিসের সমন্বিত রূপ। ঈমান, ইসলাম ও ইহসান। হাদীসের ভাষায় যেটা ইহসান কোরআনের ভাষায় সেটাকে তাযকীয়া বলা হয়েছে। আর শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এটাকে তাসাউফ বা সুলুক বলা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় এটাকে বলা হয় পীর-মুরীদি। শরীয়তে এর গুরুত্ব যে অসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি ছাড়া দ্বীন পরিপূর্ণ হতে পারে না।

কিন্তু মওদুদী সাহেবের মতে পীর-মুরীদি তরীকা অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষয়। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। যদিও তিনি মূল তাসাউফ বা ইহসানকে অস্বীকার করেন না বলে দাবি করেছেন। কিন্তু চিরাচরিত ও সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতিও পীর-মুরীদির প্রচলিত তরীকার এবং পীর-মাশায়েখগণের যেভাবে ঢালাও সমালোচনা করেছেন তাতে তাসাউফের স্বীকৃত অংশ বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। বাস্তবেও তাই মওদুদী সাহেবের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী জামায়াত-শিবিরের লোকজন তাসাউফের সাথে কোনো রূপ সংশ্লিষ্টতা রাখে না।

মাওলানা সা'দ সাহেব ও তাঁর অনুসারীদের অবস্থাও এর চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। মাওলানা সাহেব তাঁর বয়ানে তাসাউফ, তাযকিয়া ও পীর-মাশায়েখের ব্যাপারে যেসব মন্তব্য করে থাকেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি এসবে বিশ্বাসী নন। কাজেই তাঁর অনুসারীগণ পীর-মাশায়েখের সোহবতে যাওয়াকে ক্ষতিকর ও সাথী ছুট হওয়ার কারণ মনে করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা সাহেবের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো,

لوگ پوچھتے ہیں تمہارا اصلاحی تعلق کس سے ہے؟ تم کہو میرا اصلاحی تعلق دعوت سے ہے،

جو دعوت میں لگ کر بھی اپنی اصلاح کے لئے کسی بزرگ کی صحبت کی ضرورت محسوس کر رہا ہے اس نے دعوت کو سمجھا ہی نہیں۔

অর্থ : মানুষ জিজ্ঞেস করে তোমার আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক কার সাথে? তুমি বলে দাও, আমার আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক দাওয়াতের সাথে। যে ব্যক্তি দাওয়াতের মেহনতে যুক্ত থেকেও নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো বুযুর্গের সংস্পর্শের প্রয়োজন অনুভব করে সে আসলে দাওয়াতকে বুঝতেই পারেনি।

তিনি আরো বলেন,

اس راستہ میں وہ سب کچھ ہے جو ایک شیخ اپنے مرید سے کروانا چاہتا ہے۔

এ রাস্তায় ওই সকল বিষয় বিদ্যমান, যা একজন পীর তাঁর মুরীদদের করাতে চান।

یہ جو صالحین اوراد و وظائف بتاتے ہیں فلاں تسبیح اتنے ہزار پڑھ لو، ایک لاکھ پڑھ لو، کہیں سے ثابت نہیں، مسنون تسبیحات کا اہتمام کرو۔

পীর-মাশায়েখগণ যে সকল ওজিফা ও জিকির বলে থাকেন যে অমুক যিকির এত হাজার বার পড়ো, এক লাখ বার পড়ো এগুলো ভিত্তিহীন। মসনুন তসবীহাত আদায় করতে থাকো।

صالحین صوفی تھے دین کے مددگار نہیں تھے، ان کی محنت پر کرامت تو ظاہر ہو سکتی ہے نصرت ظاہر نہیں ہو سکتی، صالحین کرامت والے ہیں محنت والے نہیں۔

পীর-আউলিয়াগণ সুফি ছিলেন, দ্বীনের সাহায্যকারী ছিলেন না, তাঁদের মেহনতের ওপর কারামত প্রকাশ হতে পারে নুসরত প্রকাশ হবে না। ওলিরা কারামাতওয়ালা মেহনতওয়ালা নন।

মাওলানা সাহেবের এ সকল কথা শুনলে মনে হয় যেন, ওলী-বুযুর্গদের পথে চলা ভ্রষ্টতা। অথচ পবিত্র কোরআনে সিরাতে মুস্তাকিম যে চার প্রকার লোকের পথকে বলা হয়েছে তাদের অন্যতম হচ্ছেন সালেহীন তথা পীর-আউলিয়া।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (النساء ٦٩)

তা ছাড়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ইমানদারগণ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সূরা তাওবা ১১৯)

সারকথা হলো, তাবলীগী বয়ানের শতসিদ্ধ উসূলসমূহ লঙ্ঘন করে মাওলানা সা'দ সাহেব যেভাবে বয়ান করে যাচ্ছেন এতে তাবলীগী মেহনতের নতুন এক রূপ রেখা ফুটে উঠছে। পাশাপাশি তিনি যে ভুল আকায়েদ ও মাসায়েল বয়ান করছেন এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং আলেম-উলামাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হচ্ছে।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

বিকাশ : ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭, রকেট : ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭-৯

চিত্তবিনোদন ও খেলাধুলার শরয়ী বিধান

মুফতী মাহমুদুল হাসান

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও মধ্যপন্থী ধর্ম। সকল ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা পছন্দ করে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা এমন সংকীর্ণ নয় যে তাতে হাস্যরস ও আনন্দ-ফুর্তির অবকাশ থাকবে না। বরং স্বভাবধর্ম ইসলাম স্বচ্ছ ও বৈধ সব ধরনের চাহিদা পূরণকারী। তাতে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই। জটিলতা থেকে মুক্তি দেওয়া ও সহজ পন্থা বাতলিয়ে দেওয়া শরীয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের সহজ চান, কঠিন চান না।" (সূরা বাকারা : ১৮৫)

তাই ইসলাম পরকালকে মৌলিক উদ্দেশ্য বানিয়ে ইহকালীন সকল সুযোগ-সুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখেছে। ইসলাম যেরূপ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, শিষ্টাচার ও আদব-আখলাক ইত্যাদির বিধানাবলি আরোপ করেছে, তদ্রূপ জীবনে চলার পথে বিভিন্ন ছোটখাটো ও স্পর্শকাতর বৈষয়িক বিষয়াদির প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছে এবং খুঁটিনাটি নিয়ে আলোকপাত করেছে। যদিও পশ্চিমাদের ন্যায় পুরো জীবনকে খেলাধুলা বানিয়ে নেওয়া বা "খেলাধুলার জন্যই জীবন" এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। তবে ইসলাম বৈধতার গণ্ডিতে থেকে হাস্যরস, আনন্দ-ফুর্তি ও খেলাধুলার শুধু অনুমতিই দেয় না, বরং ক্ষেত্রবিশেষ এগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধও করে থাকে। কেননা ইসলামী শরীয়ত আলস্য, নির্জীবতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে একেবারেই পছন্দ করে না, বরং উদ্যম ও সজীবতাকে পছন্দ করে। সকল ক্ষেত্রেই অলসতাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে। আলস্যের সহিত ইবাদতকে মুনাফিকীর নিদর্শন বলে আখ্যা দিয়েছে। কোরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

"যখন তারা (মুনাফিকরা) নামাযে দাঁড়ায়, আলস্যের সহিত দাঁড়ায়।" (সূরা নিসা : ১৪৩)

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অলসতা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন।

ইসলামের এই মধ্যপন্থানীতির কারণেই সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও উম্মতের পূর্ববর্তী আদর্শ ব্যক্তিগণের জীবনাচার যেরূপ খোদাভীতি, পরকালের চিন্তা ও তাকওয়া পরহেযগারীতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ হাস্যরস, আনন্দ-ফুর্তি ও খেলাধুলার ক্ষেত্রেও তাঁদের জীবনাচারে আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ রয়েছে। উক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ রেখে নিম্নে আমরা আনন্দ-ফুর্তি ও খেলাধুলার বিধানবিষয়ক কিছু আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করব।

হাস্যরস ও চিত্তবিনোদন কি শরীয়তে অনুমোদিত?

যদি চিত্তবিনোদন কেবল অন্তরের প্রশান্তি ও আল্লাহর নিয়ামতের অনুভূতিতে হয়ে থাকে তাহলে তা কেবল বৈধই নয়, বরং উত্তমও বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

"বলো, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়'।" (সূরা ইউনুস : ৫৮)

একটি হাদীসে এসেছে,

روّحوا القلوب ساعة بساعة

অর্থাৎ, "তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে প্রশান্তি দাও।" (মুসনাদে শিহাব, হাদীস ৬৭২) তবে আনন্দ-ফুর্তি যেন অন্তরকে অহংকারী ও আল্লাহবিমুখ না করে, নচেৎ তা দোষণীয় হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَاتَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ

অর্থাৎ, "দম্ভভরে খুশি প্রকাশ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না।" (সূরা কাসাস : আয়াত ৭৬)

তদ্রূপ মানুষের সাথে রসিকতাও একটি বৈধ কাজ। মাঝেমধ্যে তা না করলে স্বভাব একেবারে শুষ্ক হয়ে যায়, এতে সহাবস্থানকারীদের মনে রূঢ়তা সৃষ্টি হতে পারে। নবী করীম (সা.) থেকেও তা প্রমাণিত। নিম্নে আমরা কয়েকটি উদাহরণ পেশ করব ইনশাআল্লাহ!

১. হাদীস শরীফে এসেছে, জনৈকা বৃদ্ধা মহিলাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। এতদশ্রবণে বৃদ্ধা মহিলা কান্না আরম্ভ করল। তখন রাসূল (সা.) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আসল কথা হলো বৃদ্ধ অবস্থায় কেউই জান্নাতে যাবে না। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের সময় আল্লাহ তা'আলা সকলকে যৌবন ফিরিয়ে দেবেন।" (শামায়েলে তিরমিযী, হাদীস ২৪১)

রাসূল (সা.) ওই বৃদ্ধার সাথে রহস্য করতে গিয়ে কথাটি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন, যা বৃদ্ধা বুঝতে পারেনি।

২. জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, আমাকে একটি উট দিন, তখন রাসূল (সা.) লোকটিকে বললেন, "আমি তোমাকে উটের বাচ্চা দেব।" তখন লোকটি বলল, হুজুর! আমি তো বাহনের উট চেয়েছি, বাচ্চা দিয়ে কী

কাজ হবে? রাসূল (সা.) বললেন, "বাহনের উপযুক্ত বড় উটটিও তো কোনো একটি উটনীর বাচ্চাই হবে।" (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস ৪৯৯৮) সামান্য সময়ের জন্য রাসূল (সা.) লোকটির সাথে রহস্য করলেন।

৩. হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কখনো (কৌতুকচ্ছলে) আমাকে "হে দুই কানবিশিষ্ট!" বলে ডাক দিতেন। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৫০০২) অথচ সকল মানুষেরই কান দুটি।

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। যাহির (ইবনে হিযাম আশজায়ী) নামের একজন গ্রাম্য ব্যক্তি প্রায়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাদিয়া দিতেন। যখন তিনি চলে যেতে উদ্যত হতেন তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, যাহির আমাদের পল্লীবন্ধু, আমরা তাঁর শহুরে বন্ধু। তিনি কদাকার হলেও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ভালোবাসতেন। একবার তিনি বেচাকেনা করছিলেন আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অলক্ষ্যে তাকে পেছন দিক থেকে ঝাপটে ধরলেন। তারপর তিনি বললেন, কে? আমাকে ছেড়ে দাও! দৃষ্টিপাত করতেই তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখে তাঁর পিঠ আরো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বুকের সাথে মেলানোর চেষ্টা করেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ গোলামটিকে কে ক্রয় করবে? যাহির বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বিক্রি করতে চাইলে তো আমাকে মূল্যহীন পাবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কিন্তু তুমি আল্লাহর নিকট অচল নও, অথবা তিনি বলেছেন, আল্লাহর নিকট তোমার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। (শামায়েলে তিরমিযী, হা. ২৪০)

৫. হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি এক সফরে (একটি জনমানবহীন নির্জন উপত্যকায়) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর আগে চলে গেলাম। অতঃপর আমি মোটা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সাথে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পিছে ফেলে দিলেন, বিজয়ী হলেন। তিনি বলেন, এ বিজয় সেই বিজয়ের বদলা। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ২৫৭৮)

রসিকতার বৈধ সীমারেখা

রসিকতার বৈধতার জন্য শর্ত হলো, এতে যেন অসত্যের মিশ্রণ না হয় এবং কারো মনে কষ্টের কারণ না হয়। যে রসিকতায় অসত্যের মিশ্রণ হয় বা তাতে কারো মনে ব্যথা আসে, তা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বোক্ত ঘটনাবলি থেকে আমরা এ শিক্ষাই পেয়েছি। কেননা উক্ত ঘটনাবলিতে তিনি কোনো অসত্যের আশ্রয় নেননি এবং তা কারো মনে ব্যথা বা সম্ভ্রমহানির কারণও হয়নি। হাদীস শরীফে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি (আল্লাহর প্রেরিত নবী হওয়া সত্ত্বেও) আমাদের সঙ্গে রসিকতা করেন? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

إِنِّى لَا أَقُوْلُ إِلَّا حَقًّا

"আমি হক ও ন্যায়বহির্ভূত কিছু বলি না।" (সুনানে তিরমিযী হাদীস ১৯৯০)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, বাহ্য ইবনু হাকীম (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁর পিতার সূত্রে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له

অর্থাৎ, "মানুষকে হাসানোর জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস।" (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪৯৯০)

পেশাগত রসিকতা ও কৌতুক অনুষ্ঠান

অভ্যাসে পরিণত হলে বা পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে বৈধ চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডও শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা পেশাগত কৌতুক ও রসিকতা মুসলমানদের চূড়ান্ত লক্ষ্য আখিরাতের সফলতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। মহামূল্যবান জীবনের ক্ষণগুলো অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হয়ে যায়। হাদীস শরীফে এসেছে,

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

অর্থাৎ, "একজন মুসলমানের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক কাজ ত্যাগ করা।" (সুনানে তিরমিযী হাদীস ২৩১৭)। অন্য হাদীসে এসেছে, "অধিক হাসি-তামাশা অন্তরকে মেরে ফেলে।" (সুনানে তিরমিযী হাদীস ২৩০৫) আর যদি তাতে শরীয়তবিরোধী অন্যান্য কর্মকাণ্ড যথা–অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা, উলঙ্গপনা, গান-বাজনা, অপচয় ইত্যাদি যোগ হয়, সেসব কৌতুক অনুষ্ঠান যে অবৈধ হবে, তা তো বলাই বাহুল্য। হ্যাঁ, কখনো কখনো হওয়াটা দোষণীয় নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষ উত্তমও। তবে আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাত বিমুখ হয়ে নয়, বরং অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখেও হাস্যরস ও চিত্তবিনোদন করা যায়। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ কি হাসতেন? তিনি বললেন–হ্যাঁ, তবে ওই অবস্থায়ও তাঁদের ঈমান পাহাড়ের

চেয়ে দৃঢ়-মজবুত থাকত। এ ছাড়া হযরত বিলাল ইবনে সা'দ (রহ.) থেকে বর্ণিত, আমি সাহাবীগণকে পেয়েছি যে তাঁরা দিনেরবেলায় নিশানাসমূহের মাঝে দৌড়াতেন এবং পরস্পরে হাস্যরস করতেন, আর যখন রাত হতো তখন দুনিয়াবিরাগী ইবাদতগুযার হয়ে যেতেন। (শরহুস সুন্নাহ ১২/৩১৮)

খেলাধুলার বিধান

খেলাধুলার ব্যাপারেও মৌলিক কথা হলো, ইসলাম মানুষকে একটি টার্গেটসম্পন্ন জীবনযাপনের পথনির্দেশ করে। অযথা হেলায়-খেলায় মত্ত থাকাকে ইসলাম ঘৃণা করে। টার্গেটসম্পন্ন জীবনযাপন, সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির চিন্তা ও আখিরাতের জীবন বিনির্মাণের ফিকিরসম্পন্ন জীবন ঈমানদারের পরিচায়ক। হেলায়-খেলায় মত্ত আখিরাতবিশ্রিত জীবনযাপন কাফেরদের নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْن

"যারা অনর্থক ও বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকে।" (সূরা মু'মিনূন : ৩) তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন প্রতিটি কাজ প্রশংসাযোগ্য, যা মানুষকে তার মূল উদ্দেশ্যের ওপর অটল রাখে। প্রত্যেক ওই কাজের অনুমতি রয়েছে, যাতে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে বা অন্তত দুনিয়া-আখিরাতের কোনো ক্ষতি তাতে নেই। অতএব খেলাধুলার মধ্যেও কেবল ওই সকল খেলাধুলার অনুমতি রয়েছে, যাতে শারীরিক বা আত্মিক কোনো উপকার রয়েছে। যে খেলায় কেবল সময় নষ্ট হয়, আখিরাত বিশ্রিত করে, অথবা অন্যের সাথে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক ও অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগতকারী- এ জাতীয় খেলা নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنه من الحق

অর্থাৎ, "মুসলমানের জন্য সকল খেল-তামাশা নিষিদ্ধ, তবে তীর চালনা, ঘোড়া চালনা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের রসিকতা, কেননা এগুলো ন্যায়সংগত।" (সুনানে তিরমিযী হা. ১৬৩৭)

বৈধ ও পছন্দনীয় খেলাসমূহ

তীর চালনা

তীর দ্বারা হোক বা বন্দুক-পিস্তল ইত্যাদি দ্বারা টার্গেট সইকরণ ও চালনা শিক্ষা করা একটি পছন্দনীয় খেলা। ক্ষেত্রবিশেষ তা ওয়াজিবও হয়ে যায়। হাদীস শরীফে এর অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। মানুষের আত্মরক্ষা ও দেশ প্রতিরক্ষায়ও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কোরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "আর তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত করো, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন।" (সূরা আনফাল আয়াত ৬০)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "জেনে রেখো! ক্ষেপণই শক্তি, জেনে রেখো! ক্ষেপণই শক্তি, জেনে রেখো! ক্ষেপণই শক্তি।" (সহীহ মুসলিম, হা. ১৯১৭)

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে, "জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই দুনিয়াতে তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং তোমাদেরকে নিজেদের ব্যয়ভার সংকুলানের চিন্তা হতে মুক্ত করে দেওয়া হবে। সুতরাং তীরন্দাজির অনুশীলন হতে তোমাদের কেউ যেন অক্ষম হয়ে না পড়ে।" (সুনানে তিরমিযী, হা. ৩০৮৩)

তরবারি ও বর্শা চালনা

এটিও আত্মরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সামরিক প্রশিক্ষণেও তা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাদীস শরীফে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর আমি হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। মসজিদের কাছে তারা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। এমন সময় উমর (রা.) এসে তাদের ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "হে উমর! তাদের অর্থাৎ বনু আরফিদাকে নিরাপদ ছেড়ে দাও।" (বোখারী, হা. ৩৫৩০)

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

এটিও ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পছন্দনীয় খেলা। শরীয়তবহির্ভূত কোনো কার্যকলাপ যথা–জুয়া ইত্যাদি মুক্ত হয়ে এ খেলা শরীয়তসম্মত ও পছন্দনীয়। এতে শারীরিক, মানসিক উপকারসহ সফরে ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থায়ও অনেক কাজে আসে। কোরআন-হাদীসে ঘোড়া লালন-পালন, ঘোড়া চালনা শিক্ষা ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও প্রস্রাব ওজন করা হবে।" (বোখারী, হা. ২৮৫৩)

হাদীস শরীফে যদিও ঘোড়ার কথা রয়েছে, কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপটে হাদীসের আলোকে আধুনিক সামরিক সরঞ্জামাদি মোটরসাইকেল, গাড়ি, হেলিকপ্টার ও বিমান চালনা এবং তার প্রতিযোগিতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দৌড় প্রতিযোগিতা

দৌড় প্রতিযোগিতা একটি শারীরিক উপকারী খেলা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি উৎসাহ

প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) দৌড় প্রতিযোগিতা দিতেন। হযরত বিলাল ইবনে সা'দ (রহ.) থেকে বর্ণিত। আমি সাহাবীগণকে পেয়েছি যে, তারা দিনেরবেলায় নিশানাসমূহের মাঝে দৌড়াতেন এবং পরস্পরে হাস্যরস করতেন, আর যখন রাত হতো তখন দুনিয়াবিরাগী ইবাদতগুযার হয়ে যেতেন। (শরহুস সুন্নাহ ১২/৩১৮)

সাঁতার প্রতিযোগিতা

সাঁতার প্রতিযোগিতা একটি শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের উপকারী খেলা। উপকূলীয় এলাকা ও নদীতে চলাচলকারী লোকদের জন্যও সাঁতার শেখা অপরিহার্য। বন্যাদুর্গত এলাকায় জনমানুষের কল্যাণে তা কাজে আসে। এ ছাড়া নৌ প্রতিরক্ষায়ও তা একান্ত অপরিহার্য। হাদীস শরীফে সাঁতার শেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، لا يكون أربعة :ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشى الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة

অর্থাৎ, "আল্লাহর স্মরণবহির্ভূত সকল জিনিসই অনর্থক ক্রীড়া-কৌতুক, চারটি জিনিস ব্যতীত, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের রসিকতা, পুরুষের ঘোড়া চালনা, দুই সীমার মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা ও সাঁতার শেখা।" (আসসুনানুল কোবরা, নাসাঈ, হা. ৮৮৯০)

কুস্তি ও কাবাডি

এ খেলায়ও শরীর চর্চা হয়ে থাকে। সতর ঠিক রেখে ও নেশামুক্ত হয়ে এ খেলাও বৈধ। ভালো উদ্দেশ্যে এ খেলাও পছন্দনীয়। হাদীস শরীফে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কার প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর রোকানা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের শর্তে তাঁর সাথে তিনবার কুস্তি প্রতিযোগিতা করে তিনবারই তাঁকে হারিয়ে দেওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (মারাসীলে আবী দাউদ, হা. ৩০৮)

অবৈধ ও নিষিদ্ধ খেলাসমূহ

পাশা খেলা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি পাশা খেলল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।" (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪৯৩৮)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি পাশা খেলল সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে তার হাত ডোবাল।" (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪৯৩৯)

দাবা খেলা

দাবা খেলাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। হযরত আলী (রা.) বলেন, "দাবা হলো অনারবীদের জুয়া খেলা।" (সুনানে বায়হাকী, হা. ২০৯২৮)

কবুতরবাজি খেলা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বললেন, "এক শয়তান আরেক শয়তানীর অনুকরণ করছে।" (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪৯৪০)

ষাঁড়ের লড়াই ও মোরগযুদ্ধ খেলা

ষাঁড়ের লড়াই মোরগের লড়াই ইত্যাদি খেলা যেগুলোতে প্রাণীর সাথে অন্য প্রাণী কিংবা মানুষের লড়াই করানো শরীয়তে নিষিদ্ধ। এতে অবুঝ প্রাণীদের অযথা কষ্ট দেওয়া ও আঘাত করা হয়, যা হারাম। আর এতে দুনিয়া-আখিরাতের কোনো লাভও নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রাণীদের পরস্পরে লড়ানোকে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ২৫৬২)

বর্তমানে প্রচলিত কিছু খেলা

তাস খেলা

এর বিধান হলো, এতে ছবিবিশিষ্ট কাগজ ব্যবহৃত হয়, অযথা সময় নষ্ট হয়, এতে শারীরিক-মানসিক কোনো উপকার বা দুনিয়া-আখিরাতের কোনো লাভও নেই। তাই এ খেলা যদি জুয়ামুক্তও হয় তবুও মাকরূহে তাহরীমি তথা নাজায়েয হবে। আর যদি তাতে জুয়া যোগ হয় তাহলে তো তা কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত স্পষ্ট হারাম। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৬৭)

বক্সিং ও ফাইটিং

নেশাবিহীনভাবে কুস্তি খেলা বৈধ হলেও প্রচলিত বক্সিং ও ফাইটিং খেলায় অনেক ধরনের শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ যোগ হওয়ায় এগুলো অবৈধ। কেননা এতে বিপক্ষের শরীরে ইচ্ছাকৃত আঘাত ও জখম করা হয় এবং এতে কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হয় না, বরং বিজয়ী পক্ষ এতে আরো আনন্দিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা নিজেদের ধ্বংসে নিপতিত করো না।" এ ছাড়া এতে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ইত্যাদিও রয়েছে।

কেরাম বোর্ড খেলা

এ খেলা জুয়া ও নেশামুক্ত হয়ে কখনো কখনো খেলা যাবে। আর এগুলো যুক্ত হলে অবৈধ।

ভিডিও গেইম

প্রাণীর ছবি, বাদ্য-বাজনা, উলঙ্গপনা ইত্যাদি মুক্ত নেশাবিহীনভাবে হলে এর সুযোগ রয়েছে। তবে এর নেশায় বুঁদ হয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তা নিষিদ্ধ হবে।

হার-জিতে বিনিময়ের মাধ্যমে খেলা

উল্লিখিত অবৈধ খেলাসমূহ তো সর্বদায়ই

অবৈধ। বৈধ খেলায়ও শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ যোগ হলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাই দুই বা ততোধিক পক্ষের পারস্পরিক খেলায় পরাজিত পক্ষের ওপর বিজয়ী দলকে নির্ধারিত অর্থ আদায় করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, যদি খেলার বাইরে তৃতীয় কোনো পক্ষ নির্ধারিত অর্থ দেয় তাহলে তা পুরস্কার গণ্য হয়ে বৈধ হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৬/৬০৬)

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, টেনিস ও ভলিবল

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ভলিবল- এজাতীয় খেলায় শরীরচর্চা ও শারীরিক উপকার হয় বিধায় তা মৌলিক বিচারে বৈধ বলা গেলেও তাতে বর্তমানে অনেক ধরনের শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাওয়ায় অনুষ্ঠিত এসব খেলা সম্পূর্ণ অবৈধ। (দেখুন : ইমদাদুল মুফতীন পৃ. ১০০০)। এতে সংঘটিত শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপগুলো নিম্নরূপ :

১. এগুলোর কিছু খেলায় সতর খুলে রাখা হয়।

২. কিছু খেলায় পুরুষের জার্সি টাখনুর নিচে পরিহিত থাকে।

৩. প্রায় খেলার স্থানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও উলঙ্গপনা।

৪. খেলা অবস্থায় মাঝে মাঝে গান-বাজনাও হয়।

৫. খেলা অবস্থায় খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়েরই আল্লাহর মৌলিক বিধানাবলি যথা–নামায, রোযা আদায়ে চরম বিঘ্ন ঘটে।

৬. বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় হয়।

৭. মহামূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

৮. জুয়া, প্রতারণা, ম্যাচ ফিক্সিং ইত্যাদি হারাম ও অনৈতিক কাজ হয়।

৯. খেলায় পারদর্শী লোকদের জাতির হিরো হিসেবে পেশ করার কারণে শিশুরা খেলোয়াড়দেরই নিজেদের আদর্শ বানিয়ে নেয়। এবং

১০. এসব খেলায় গভীর মগ্ন ও নেশায় বুঁদ হয়ে আল্লাহ ও আখিরাত ভুলে যায়।

অবৈধ খেলা দেখা

যেসব কারণে যে যে খেলা নিজে খেলা অবৈধ বা হারাম, সেসব কারণে ওই খেলা দেখাও নিষিদ্ধ। চাই তা সরাসরি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে দেখুক বা টেলিভিশনে দেখুক। কেননা সেখানে অন্যের সতর দেখা, গান-বাজনা, সময় নষ্ট হওয়া, আল্লাহর বিধানাবলি আদায়ে চরম বিঘ্ন ঘটা, নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা ও খেলা উন্মাদনায় ডুবে ও নেশায় বুঁদ হয়ে আল্লাহ, আখিরাত ভুলে যাওয়া ইত্যাদি। আর বর্তমানে টেলিভিশন তো একটি সর্ব গোনাহের আড্ডাখানা।

অবৈধ খেলার খবরাখবর রাখা

নিজে অবৈধ খেলায় লিপ্ত না হয়েও যদি এসব খেলায় সমর্থন বা তার খবরাখবরে আনন্দ প্রকাশ করে উজ্জীবিত হয়, তাহলে সেও খেলোয়াড়, আয়োজক ও দর্শকদের ন্যায় গোনাহগার হবে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন জমিনের কোনো অংশে গোনাহ সংঘটিত হয়, কোনো ব্যক্তি ঘটনাক্রমে উপস্থিত থেকেও তা অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন সেখানে অনুপস্থিত থাকল। আর যে ব্যক্তি সেখানে অনুপস্থিত থেকেও তার ওপর আনন্দিত হলো, তাহলে সে যেন ওই গোনাহে উপস্থিত ও অংশীদার ছিল।" (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪৩৪৫)

বিশ্বকাপ উন্মাদনা

সারা পৃথিবী এখন উন্মত্ত হয়ে আছে বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে। যেন পৃথিবীতে এখন ক্ষুধা নেই, দারিদ্র্য নেই, রোগব্যাধি নেই, শিক্ষার সমস্যা নেই এবং সম্পদের অভাব নেই। বিশ্বকাপ আয়োজক দেশের খরচ হচ্ছে হাজার হাজার কোটি ডলার। খেলা চলাকালে দৈনিক খরচ কয়েক শত কোটি ডলার। এ ছাড়া রয়েছে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর বিপুল ব্যয়। অথচ পৃথিবীর দেশে দেশে কোটি কোটি বনি আদম চরম দারিদ্র্যের শিকার। তারা যাপন করছে মানবেতর জীবন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা–এসব মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত পৃথিবীর শতকোটি মানুষ। এই বিপুল অর্থ, মেধা ও শ্রম যদি ব্যয় হতো পৃথিবী থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করার কাজে এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে, তাহলে মানবতার কত কল্যাণ হতো!

এমনকি বাংলাদেশের ন্যায় একটি রাষ্ট্র, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যার নিত্য বাস, খেলাধুলার নামে দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঢালা হয় কোটি কোটি টাকা, জনগণ নিজের পকেটের টাকা খরচ করে, এমনকি জমি বিক্রি করেও ভিনদেশি পতাকা উত্তোলনে আনন্দ পায়, অথচ বিভিন্ন সেবাকর্ম এবং বহু গবেষণা-প্রকল্প থেমে থাকে প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে! এই দেশ, এই জাতি কিভাবে স্বপ্ন দেখতে পারে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের?

আহ! আজ মুসলমান অবৈধ খেলার উন্মাদনায় দিন-রাত পার করে, দিন-রাতের ভাবনা এখন ফিলিস্তিন বা ইরাক-আফগানিস্তানের মজলুম ভাইয়েরা নয়! কোথায় হিংস্র হায়েনাদের থাবায় মুসলিম উম্মাহর কত রক্ত ঝরছে তাদের চিন্তা সে সম্পর্কে নয়। তাদের কৌতূহল শুধু কোন খেলোয়াড় কতটি গোল দিয়েছে। হায়! কবে আমাদের হুঁশ হবে।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : নামায

মুহাম্মদ রুহুল আমিন
খাদেমে মারকায।

জিজ্ঞাসা :

বড় মসজিদ কিংবা মাহফিলে নামায চলাকালীন অবস্থায় যদি মাইক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে জেনারেটর ছাড়া বা মাইক সংযোগ দেওয়ার জন্য একজনের নামায ভেঙে চলে যাওয়া বৈধ হবে কি না?

উল্লেখ্য, যদি একজনে নামায ভেঙে না যায় তাহলে বহু মুসল্লির নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত পরিস্থিতিতে যদি আমালে কলীল, যেমন–জেনারেটর বা মাইকের মেশিন কাছে থাকলে এক হাত দ্বারা ১-২ বার চেষ্টার মাধ্যমে জেনারেটর চালু করা বা মাইক সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে এমতাবস্থায় নামায ভাঙা জায়েয হবে না, বরং নামাযে থেকেই উক্ত কাজ সমাধান করতে পারবে, অন্যথায় নামায ভাঙা জায়েয হবে। তবে উচিত হলো, মুকাব্বির নির্ধারণ করে রাখা, যাতে কারো নামায ভাঙতে না হয়। (আদ্দুররুল মুখতার-১/৬৫৪, হিন্দিয়া-১/১০১, ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়া-৭/৪৬৫)

প্রসঙ্গ : সুদমুক্ত ব্যাংক

মুহাম্মদ শরীফ আহমেদ

জিজ্ঞাসা :

প্রশ্ন-১ : বাংলাদেশে কোন কোন ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে (F, D Fired Deposit) সুদের পরিবর্তে মুনাফা দেয় এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয কি না দয়া করে জানালে উপকৃত হব।

প্রশ্ন-২ : AB Bank (Islamic branch) at kakrail এর শাখার ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানাবেন।

সমাধান–১-২ :

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের (যেমন–ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি., শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লি.) কর্তৃপক্ষের দাবি হলো তাদের ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও লেনদেন শরয়ী নীতিমালার আলোকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং এর তদারকির জন্য তারা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। তাদের দাবির বাস্তবতা কার্যক্ষেত্রে যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় এবং এর বিপরীত কোনো কিছু প্রকাশ না পায় তাহলে তাদের দেওয়া মুনাফা ভোগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয, অন্যথায় জায়েয হবে না। (সূরা বাকারা-১৬৮, বোখারী শরীফ-১/২৭৫, আল ইকতিসাদুল ইসলামী-১/২২২)

প্রসঙ্গ : টিভি/কম্পিউটার মেরামত

মুহাম্মদ বজলুর রহমান
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি একজন ইলেকট্রনিকস মেকানিক। আমার কিছু ব্যাপারে প্রশ্ন আছে দয়া করে উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

১. আমি টেলিভিশন ঠিক করতে পারব কি? ২. আমি কম্পিউটারের মনিটর ঠিক করতে পারব কি? ৩. আমি এম্পলি ফায়ার, যাহা দ্বারা মাইক, সাউন্ড বক্স, মাইক্রোফোন চালানো হয়- এগুলো তৈরি ও মেরামত করে থাকি। উল্লেখ্য, আমি এ পর্যন্ত অনেক মসজিদ ও মাদরাসাতে এই জিনিস তৈরি করে দিয়েছি এবং বহু মেরামত করেছি। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাজে এগুলো তৈরি ও মেরামত করেছি। এখন আমি জানতে চাই, এম্পলি ফায়ার তৈরি ও মেরামত করতে পারব কি না? পারলে কোন ক্ষেত্রে, না পারলে কেন?

সমাধান-১ :

টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে অশ্লীল ছবি, ফিল্ম, গান ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে থাকে তাই এর মেরামত অশ্লীল কাজে এক প্রকার সহযোগিতা করার নামান্তর বিধায় আপনার জন্য এগুলোর মেরামত করা অনুচিত। (রদ্দুল মুহতার-৬/৩৯১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/৪৫, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৬/২১৮)

সমাধান-২ :

শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেক কাজ তার উদ্দেশ্যের অনুগত হয়ে থাকে আর কম্পিউটার একটি নতুন প্রযুক্তিব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বিশ্বের খবরাখবর, হিসাব কিতাব ইত্যাদির প্রয়োজন অতি অল্প সময়ে মিটিয়ে দেয় এবং সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের একটি মাধ্যমও হতে পারে। সুতরাং এগুলোর মেরামত ইত্যাদি বৈধ হবে। অপব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী দায়ী থাকবে। (রদ্দুল মুহতার-১/৩৯১, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/৪৫, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-২/২৬৮)

সমাধান-৩ :

এম্পলি ফায়ার, যার দ্বারা মাইক, সাউন্ড বক্স, মাইক্রোফোন চালানো হয় আপনার জন্য এগুলোর তৈরি ও মেরামত বৈধ। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/৪৫, ফতওয়ায়ে রহিমিয়া-২/২৬৮)

প্রসঙ্গ : কোরবানী

মাওলানা মুশাররফ হোসেন
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

জিজ্ঞাসা :

গ্রাম এলাকায় প্রচলন আছে যে গাভিতে অন্য ষাঁড়ের বীর্য ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয় যাতে করে গাভিটি গাভিন হয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো, এমন পদ্ধতি অবলম্বন করার শরয়ী বিধান কী? যদি এমনটি সঠিক না হয় তাহলে উক্ত গাভির বাচচা দ্বারা কোরবানী সঠিক হবে কি না?

সমাধান :

ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে বীর্য প্রদান করে কোনো গাভিকে গাভিন বানানো একটি ঘৃণিত কাজ। এতদসত্ত্বেও উক্ত গাভি ও তার পেটের বাচ্চার গোশত খাওয়া বৈধ হবে এবং তা দ্বারা কোরবানীও শুদ্ধ হবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/২৯৭, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৯/৩২৮)

প্রসঙ্গ : দাড়ি

মুহাম্মদ লাইস আল মাহমুদ
দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

জিজ্ঞাসা :

শরীয়তে দাড়ি রাখার হুকুম কী এবং কতটুকু পরিমাপ দাড়ি রাখতে হবে?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ি রাখা ওয়াজিব। দাড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা হারাম ও কবীরা গোনাহ। (বোখারী শরীফ-৫৭৯২, আবু দাউদ শরীফ-১/১৮৬, আল বাহরুর রায়েক-২/৪৯০)

প্রসঙ্গ : যাকাত

মুফতী নূর আহমদ
উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১. হারাম মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? ২. ব্যাংক লোনের অংশ যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বাদ যাবে কি না? নাকি উভয়ের ওপর যাকাত আসবে? ৩. যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসার জায়গা ক্রয় করা এবং বিল্ডিং করা যাবে কি?

সমাধান-১ :

পরিপূর্ণ হারাম মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয় বরং তার মালিক পাওয়া গেলে উক্ত মাল তাকে পৌঁছে দেওয়া ওয়াজিব, অন্যথায় গরিবদের মাঝে সওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করা ওয়াজিব। (আবু দাউদ শরীফ-৫৯, রদ্দুল মুহতার-২/২৯১, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-৬/৪৯)

সমাধান-২ :

জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে যে লোন নেওয়া হয় তা মূলত ঋণ আর যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে উক্ত ঋণ বাদ দিয়ে হিসাব করতে হয়, তাই ব্যাংক লোন বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যাকাতযোগ্য সম্পত্তি যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহতার-২/২৬৩, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/২৫০)

সমাধান-৩ :

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ গরিব-মিসকীনদের মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। তাই সরাসরি যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসার জায়গা ক্রয় করা এবং বিল্ডিং নির্মাণ করা যাবে না। (সূরা তাওবা-৬০, রদ্দুল মুহতার-২/৩৪৪, ফাতাওয়ায়ে উসমানী-২/১৪১)

প্রসঙ্গ : আর্থিক জরিমানা

মাওলানা ওবায়দুল গফুর
দৌলতখান, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যখন মাদরাসার নিয়ম-কানুনের খেলাফ করে তখন তাদেরকে বিভিন্ন শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয়। এতে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তাই আমরা মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে এখন আর শারীরিক শাস্তি দেওয়া হবে না বরং অপরাধ হিসেবে জরিমানা নেওয়া হবে। জানার বিষয় হলো, এভাবে জরিমানা নেওয়া বৈধ হবে কি না? এবং এ জরিমানা কোন ফান্ডে জমা নেওয়া হবে। জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অপরাধের কারণে আর্থিক জরিমানা নেওয়া বৈধ নয়। তাই শিক্ষার্থীদের থেকে আর্থিক জরিমানা নেওয়া জায়েয হবে না। তবে ভয় দেখানোর জন্য জরিমানার নামে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফেরত দেওয়ার নিয়্যাতে সংরক্ষণ করে রাখলে এবং বছর শেষে গোপনে গোপনে ফেরত দিলে বৈধ হবে। অথবা ফ্রি খানা বন্ধ করে কিনে খেতে বাধ্য করাও যেতে পারে। (আদ্দুররুল মুখতার-৪/৬১, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া-২/১৬৭, ফাতহুল বারী-২/১৬২)

প্রসঙ্গ : জানাযা

মুহাম্মদ হাদীউজ্জামান
দক্ষিণখান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

কোনো মাইয়্যেতের ওলি বা অভিভাবক জানাযার নামাযে শরীক থাকার পরও কি ওই মাইয়্যেতের দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া যাবে?

সমাধান :

মৃত ব্যক্তির বালেগ ওলি/অভিভাবক জানাযার নামাযে শরীক থাকা বা অনুমতি দেওয়ার পরে দ্বিতীয় জানাযা বা একাধিক জানাযা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (আদ্দুররুল মুখতার-২/২৭৩, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৬৪, ফাতহুল কাদির-২/৮৩)